শিক্ষার সঙ্কট

অন্নদাশঙ্কর রায়

শঙ্কর প্রকাশন
১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা—৬

শ্রীসতীকান্ত গুহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য প্রবন্ধ সংকলন

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ

খোলা মন খোলা দরজা

দিশা

শুভোদয়

বাংলার রেনেশাঁস

ড্রাগনের দাঁত

কাঁদো, প্রিয় দেশ

সাহিত্যের সঙ্কট

সূচীপত্র

ভূমিকা

একদিন আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। আপনা হতে লেখা হয়ে যাচ্ছে শাদা জমির উপর কালো কালির লিখন। আগাগোড়া ইংরেজীতে। সে ইংরেজী আমার নয়। আমার ইংরজেীতে বিস্তর কাটাকুটি থাকে। সেই বিশুদ্ধ ইংরেজী আমার অবচেতন মন থেকেও আসতে পারে না। তবে কি কোথাও পড়েছি, ভুলে গেছি। না, তাও নয়। বাক্যের পর বাক্য স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। এতদিন পরে তার পুনরুদ্ধার অসম্ভব। বছর তিন চার পরে লিখছি। মর্মটুকুই স্মরণ আছে।

"দু'শো বছর আগে স্থির হয়ে যায় মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা কী রকম হবে। ক্রমে ক্রমে একটার পর একটা দেশ সেই ব্যবস্থা স্বীকার করে নেয়। এখন আর পেছিয়ে যাবার পথ নেই। যেতে হলে এগিয়ে যেতে হবে। আবার সব দেশের মানুষ যেটা মেনে নেবে সেটাই হবে ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থা।"

এখন এই আশ্চর্য স্বপ্নের অর্থ কী তা শিক্ষাবিদ্‌রা বিচার করে দেখুন। আমি স্বপ্ন দেখেই খালাস। এক এক দেশের শিক্ষার ঐতিহ্য এক এক রকম। কিন্তু নিয়ামক হবে কি ঐতিহ্য না আধুনিকতা? আদর্শ না বাস্তব? জাগতিক রিয়ালিটির থেকে বিযুক্ত হয়ে কোনো দেশের কোনো যুগের শিক্ষা ব্যবস্থাই

চিরন্তন হতে পারে না, সার্বজনীন হতে পারে না। অথচ প্রাচীন ভারতের বা প্রাচীন গ্রীসের আদর্শকেও অবাস্তব বলে খারিজ করা যায় না। নৈমিষারণ্য, তক্ষশীলা, অ্যাথেন্স এখনো মানুষের মেঘাচ্ছন্ন জীবনে এক একটি আলোকস্তম্ভ।

আজকের মানুষ বৃত্তির উপরে এক চোখ রেখে, সংস্কৃতির উপর আরেক চোখ রেখে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আমি এর উর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। শিক্ষা প্রসঙ্গে দু'কথা বলার অধিকার যদি আমার মতো অব্যাপারীর থাকে তবে সেটা এইজন্যেই যে, আমিও এককালে এক্সপেরিমেণ্ট করেছি। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ কন্যাকে নিয়ে। লোকে কেমন অবলীলার সঙ্গে ত্রিভাষী সূত্রের কথা আওড়ায়। আমার ছিল একভাষী সূত্র। আমি এখনো বিশ্বাস করি যে, শতকরা সত্তরজন নিরক্ষর দেশবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে একভাষী সূত্রই একমাত্র সূত্র। মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বিভাষীও হতে পারে, ত্রিভাষীও হতে পারে। কিন্তু কাউকেই বাধ্য করা উচিত নয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

শিক্ষার সঙ্কট

শিক্ষার সঙ্কট

আধুনিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সে জিনিস ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছে। ইউরোপেও তার সূত্রপাত বেশীদিন আগে নয়। এখানের মতো সেখানেও ইতর সাধারণের জন্যে ছিল একটু পড়তে শেখা, একটু লিখতে শেখা, একটু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে শেখা। আর ব্রাহ্মণ বা পাদ্রীর জন্যে শাস্ত্রাধ্যয়ন। ইতর সাধারণ শিখত মাতৃভাষায় আর ব্রাহ্মণ বা পাদ্রীরা সংস্কৃত বা লাটিন ভাষায়। উচ্চশিক্ষা আর নিম্নশিক্ষার মাঝখানে ছিল অলংঘ্য প্রাচীর।

ব্যতিক্রম হিসাবে ছিল আরো একপ্রকার শিক্ষা। সেটা হতো বড়লোকদের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কল্যাণে। পাঠশালায় বা টোলে বা পাদ্রীদের স্কুল কলেজে তার জন্যে ব্যবস্থা ছিল না। থাকলেও গৌণভাবে। সেটা হলো কাব্যপাঠ বা ক্লাসিক চর্চা। সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক ভাষায়। রাজসভার সভাসদ বা অভিজাত শ্রেণীর দু'চারজন ব্যক্তি বহুব্যয়ে কালিদাস বা ভবভূতি, ভার্জিল বা অ্যারিস্টটল পড়তেন। রাজসভায় বা জমিদারের বৈঠকখানায় তা নিয়ে আলাপ আলোচনাও হতো।

ইউরোপে যখন ছাপাখানার প্রবর্তন হয় তখন শাস্ত্র অশাস্ত্র সবরকম কেতাব স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়। কেনে যারা তারা

দোকানদার কারিগর শ্রেণীর লোক। ততদিনে শহরের বিস্তার, বাণিজ্যের বিস্তার হয়েছিল। রাজারাজড়া নয়, অভিজাত নয়, ব্রাহ্মণ বা পাদ্রী নয়, এমন কতক লোক মুদ্রিত পুস্তক কেনে ও পড়ে। সেইভাবে ঘরে ঘরে বিদ্যাবিস্তার হয়। বলা বাহুল্য ধর্মগ্রন্থেরই চাহিদা ছিল বেশী, কিন্তু গ্রীক লাটিন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিও বহুল প্রচারিত হয় ও তার ফলে রেনেসাঁস ঘটে। বিজ্ঞানচর্চাও বেড়ে যায়। বিচিত্র বিষয়ের চাহিদা যখন দেখা দিল জোগানও সেইসঙ্গে উপস্থিত হলো। পাদ্রীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে কাব্যচর্চা দর্শনচর্চা আইনচর্চা ও পরে বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তিত হলো। ধীরে ধীরে সে সব প্রতিষ্ঠান সেকুলার হয়ে গেল। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধেও লাটিন না জানলে ও বাইবেল পড়া না থাকলে অক্সফোর্ডে বা কেমব্রিজে ঢুকতে দিত না।

যে শিক্ষা সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরে আবদ্ধ ছিল সে শিক্ষা মধ্যবর্তী স্তরেও ছড়িয়ে যায়। যে কোনো মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ইচ্ছামতো বই কিনতে পারেন, না পারলে লাইব্রেরীতে পড়তে পান। মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রের গ্রাহক হয়েও সেইসূত্রে জ্ঞানলাভ করেন। দৈনিকপত্রের পাঠক হন। শিক্ষিত বলে গণ্য হতে হলে রাজরাজড়া বা সভাসদ্ বা বড়লোক হতে হবে, অথবা হতে হবে পাদ্রী, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। এই অধ্যায়ে ইউরোপের নবপর্যায়ের শিক্ষা ভারতেও প্রবর্তিত

হয়, তারপরে অন্যান্য দেশেও। এখন তো দুনিয়ার সর্বত্র সেই ধরনের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি, তেমনি সেকুলার।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে যায়। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তখন এতকাল যাদের ইতর সাধারণ বলে শুধু একটু পড়তে বা লিখতে বা আঁক কষতে শেখানো হতো তাদের মধ্যেও বিদ্যাবিস্তারের প্রশ্ন ওঠে। তারাও আরো কম দামের বই কাগজ কেনে। বিশেষত নভেল বা রোমান্স। জাপানের দৈনিকপত্রিকায় ইতরজন পাঠ্য অলীক কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইতরজন পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীলরা ফতোয়া দেন যে ইতর ভদ্র সবাইকে স্কুলে পাঠাতে হবে, না পাঠালে বাধ্য করা হবে। তবে স্কুলের পর কলেজে পাঠাবার জন্যে তেমন কেউ ব্যস্ত ছিলেন না। কলেজ হবে সর্বসাধারণের জন্যে নয়, মধ্যবিত্তদের বা ঊর্ধ্বতন স্তরের জন্যে। ইউনিভার্সিটিও তাই। সেক্ষেত্রে বাধ্যতার প্রশ্ন ওঠে না।

সেই যে একটু পড়ানো, একটু লেখানো, একটু আঁক কষানো সেটা এখন উন্নত দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থার নিম্নতম স্তরেও অপ্রচলিত। ওইটুকু শিক্ষা দিয়ে কোনো নাগরিককেই বিদায় দেওয়া হয় না। তার ইচ্ছা থাক আর নাই থাক তাকে চোদ্দ বছর বা ষোল বছর বা আঠারো বছর পর্যন্ত অনেক রকম বিদ্যা শেখাতেই হবে। তবে তাকে কলেজে যেতে বাধ্য করা হবে

না। কলেজের বিকল্পও আছে। যেখানে সে কারিগরি শিখতে পারে, মিলিটারি ট্রেনিং পেতে পারে, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে তালিম পেতে পারে। তবে মুখ্য স্রোতটা কলেজমুখী। কলেজে যারা যেতে চায় তারা যোগ্য হয়ে থাকলে সরকারী বেসরকারী স্কলারশিপ পায়। অক্‌সফোর্ড কেমব্রিজের শতকরা আশিজন ছাত্রই নাকি স্কলারশিপের টাকায় পড়াশুনা চালায়। নইলে ঘরের খরচে পড়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

উন্নত দেশগুলিতে যে প্যাটার্ন লক্ষিত হচ্ছে তা অল্প কথায় এই যে, স্কুলের শিক্ষা হবে সার্বজনীন ও বিনামূল্যে লভ্য। কলেজের শিক্ষা হবে অধিকাংশ ছাত্রের অধিগম্য, কিন্তু বিনামূল্যে নয়। হয় ঘরের টাকায় নয় স্কলারশিপের টাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কম ছাত্রের জন্যে। তাদের বেশীর ভাগই স্কলারশিপ পায়।

উন্নত দেশ বললে এটাও বোঝায় যে তার অর্থনীতি শিক্ষার ব্যয় বহন করতে সক্ষম। যেখানে অক্ষম সেখানে হয় নিম্নশিক্ষা নয় অবহেলিত হয় উচ্চশিক্ষা। আমাদের এদেশে এখনো নিরক্ষরের অনুপাত ভয়াবহ। বোধহয় শতকরা সত্তর। স্কুলের প্রাথমিক সোপানও সার্বজনীন নয়, বাধ্যতার প্রশ্নও ওঠে না। আমাদের ধনবল যেমন কম তেমনি উপযুক্ত শিক্ষকেরও অপ্রাচুর্য। একটু পড়াতে, একটু লেখাতে, একটু কষাতে সকলেই পারেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী পারতে হলে

নিজেকেই ট্রেনিং নিতে হবে। কোথায় এত ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষক ?

স্কুলের শিক্ষা যদি কাঁচা থেকে যায় তবে সেইসব কাঁচা ছাত্রদের কলেজে ঢুকতে দেওয়াই ভুল। কিন্তু তারা যাবেই বা কোথায়! কলেজের যতগুলো বিকল্প অন্যান্য উন্নত দেশে দেখা যায় এদেশে ততগুলো নয়। আর দেখা গেলেই বা কী ? যারা কলেজের পক্ষে কাঁচা তারা তার বিকল্পগুলির পক্ষেও অনেক সময় কাঁচা।

স্কুলের শিক্ষার সংস্কার না করে কলেজের শিক্ষার সংস্কার যেন গোড়া কেটে আগায় জল। অনুপযুক্ত ছাত্রদের দিয়ে একটি কি দুটি বাদে প্রায় প্রত্যেকটি কলেজ ভরে গেছে। তারা গায়ের জোরে ডিগ্রী আদায় করতে পারে, কিন্তু ডিগ্রীলাভ আর শিক্ষালাভ তো একই জিনিস নয়। ডিগ্রীলাভ করে তারা যে চাকরিবাকরির যোগ্য হবে এটা তাদেরি মনের মরীচিকা। গায়ের জোরে হয়তো চাকরিও আদায় করবে ও তাতে টিকেও থাকবে, কিন্তু জনসাধারণকে তাদের প্রদত্ত করের বিনিময়ে সেবা দিতে পারবে না। জনসাধারণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত জল করে যে ট্যাক্স জোগাবে তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ শাদা হাতী পোষা হবে। আজ আমরা ছাত্রবিদ্রোহ দেখছি, কাল আমরা গণবিদ্রোহ দেখব।

যে ট্যাক্স জোগায় সেই হচ্ছে আসল মালিক। তার সেবার

জন্যেই সরকারের এতগুলো বিভাগ। সে যদি দেখে যে এসব বিভাগের উদ্দেশ্য জনসেবা নয়, শ্বেতহস্তী পোষণ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অপদার্থ সন্তানদের বোঝা বহন, তা হলে সে সত্যি সত্যি বাসুকীর মতো মাথা ঝাড়া দেবে আর ঘটে যাবে একটা ভূমিকম্প। ধনিকদের বিতাড়ন করে মধ্যবিত্তদের তাদের জায়গায় বসানোই বিপ্লবের শেষ কথা নয়। সে অধ্যায়ের পর আরো অধ্যায় আছে।

এখানে পরিষ্কার করে বলি যে আগেকার দিনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, জীবিকা উপার্জন নয়। কিন্তু এখনকার দিনে জীবিকা উপার্জনও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকের বেলা একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবিকাকে শিক্ষার বাইরে রাখা আজকের দিনে আর সম্ভব নয়। শিক্ষার ব্যবস্থা যাঁরা করবেন জীবিকার ব্যবস্থাও তাঁদেরকেই করতে হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবে সরকার এখনো রাজী নন।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তখন ইংরেজদের মধ্যেই অনেকে এর বিরুদ্ধতা করেন। তাঁদের একভাগ বলেন প্রাচ্য শিক্ষাই ভারতের আদর্শ, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হলে আদর্শভ্রংশ ঘটবে, আদর্শভ্রংশ ঘটলে একূল ওকূল দু'কূল যাবে, সেটা কি ভালো হবে? আরেক ভাগ বলেন, ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে এরা চাইবে ইংরেজের মতো চাকরি, কোথায় এত চাকরি? চাকরি না পেলে এরা অসন্তুষ্ট

হবে, কেমন করে রোধ করা যাবে এদের অসন্তোষ ? যে শিক্ষা প্রবর্তিত হলে বেকার সমস্যা অবশ্যম্ভাবী সে শিক্ষা প্রবর্তন করা মানেই তো যে সমস্যা নেই তাকে সৃষ্টি করা।

ইংরেজী শিক্ষার স্বপক্ষে যারা ছিলেন তাঁরাই জিতলেন। মেকলের কাস্টিং ভোটের জোরে। মেকলের উদ্দেশ্য ছিল একটি ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও প্রভাববিস্তার। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ তাকে ক্রমে ক্রমে ইংরেজবিরোধী করে তোলে। সেই শ্রেণীর নেতৃত্বেই ইংরেজ রাজত্ব হটে যায়। বাহাদুর শা জাফর বা নানা সাহেবের নেতৃত্বে নয়। তারপরে সেই শ্রেণীই এখন ব্রিটিশবর্জিত ভারতের হর্তাকর্তা হয়ে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলছে সে আর ইংরেজী শিখবে না. তার বদলে শিখবে হিন্দী ইত্যাদি ভাষা। যেন ইংরেজী শিক্ষা কেবল ভাষাশিক্ষার ব্যাপার।

ইংরেজী শিক্ষা বলতে তখনো বোঝাত, এখনো বোঝায়. আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা। যাতে স্কুল আছে, কলেজ আছে. বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যাতে বিজ্ঞান আছে, পাশ্চাত্য দর্শন আছে, ইতিহাস ভূগোল আছে। যাতে ম্যাট্রিকুলেশন আছে. বি. এ. আছে, এম. এ. আছে। এটা এখন সারা দুনিয়ার পদ্ধতি। এ সব ডিগ্রী এখন আন্তর্জাতিক মান নির্ণয়ের দণ্ড। তুমি তোমার খুশিমতো ডিগ্রী বিতরণ করতে পারো, কিন্তু তোমার ডিগ্রীধারীরা অন্যত্র স্বীকৃতি পাবে না। তোমার কাছেই

ফিরে আসবে আর তোমারই শিলনোড়া দিয়ে তোমারি দাঁতের গোড়া ভাঙবে। আমাদের আজকের শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ধারা ধরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, একে আর কোনোমতেই পিছু হটানো যাবে না।

আন্তর্জাতিক মানই এখন অন্তর্ভারতীয় মান। ভারতের জন্যে আলাদা একটা পদ্ধতি প্রণয়নের প্রত্যেকটি চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের, তেমনি গান্ধীজীর, তেমনি গুরু-কুলের, তেমনি স্বদেশীযুগের ন্যাশনাল কাউন্সিলের। দেশের লোক গ্রহণ করেনি কিংবা গ্রহণ করলেও সার গ্রহণ করেনি, খোসা গ্রহণ করেছে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অসংখ্য দোষত্রুটি গত সত্তর বছর ধরে সর্বত্র আলোচিত হয়েছে, অথচ আজকাল গ্রামে গ্রামে ইংরেজী মডেলের স্কুল কলেজ গজিয়ে উঠছে। গড্ডলিকার মতো ছেলেমেয়েরা ছুটেছে সেখানে। জানে বেকার হবে, কোথাও পাত্তা পাবে না, তবু একটা সার্টিফিকেট বা একটা ডিগ্রী তাদের চাই। আর কিছু না হোক সমাজে তো মান বাড়বে। লোকে তো শিক্ষিত বলে সমীহ করবে। ফেল করলেও তো বলতে পারা যাবে, আমি কলেজে পড়েছি।

এর প্রসার কেউ রোধ করতে পারবে না কারণ মানুষমাত্রেই সমাজে উঠতে চায়। একটি ডোম আমার কাছে মোড়া বেচতে আসত। সেও কথায় কথায় ইংরেজী বুকনি দিত। আমি তাকে যতই বাংলা প্রতিশব্দ শোনাই সে ততই ইংরেজী

বিদ্যা কলায়। এর কারণ সেও বোঝাতে চায় যে সে সাধারণ ডোম নয়, শিক্ষিত ভদ্রলোক হতে তার সাধ।

একবার ইংরেজী শিক্ষার স্বাদ পেলে গ্রামের ছেলে আর গ্রামে ফিরে যায় না, চাষীর ছেলে আর চাষে ফিরে যায় না। সকলেই চায় শহুরে ভদ্রলোক হতে। ইংরেজী শিক্ষার বদলে যেসব প্রদেশে হিন্দী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে সেসব রাজ্যেও একইহাল। বিহারের দেহাতী ছেলেদের লক্ষ্য চাপরাশি বা পিয়ন হওয়া, দু'পয়সা উপরি রোজগার করা ও শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে গণ্য হওয়া। তাতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যায়। বিয়েতে বিহারীরা পণ নিত না বাঙালীরা নিত বলে রাজেন্দ্রপ্রসাদজী একবার বাঙালীদের উপর একহাত নিয়েছিলেন। "এই দেখ, বাঙালীরা শিক্ষাদীক্ষার এত গর্ব করে, তবু পণ সমস্যার সমাধান করতে পারল না, আর আমরা মুখ্যু বিহারী, আমাদের মধ্যে ও পাপ নেই।" কিন্তু ইদানীং লেখাপড়া শিখে ইতর ভদ্র সকলেই পণ নিতে শুরু করেছে তাঁর সাধের বিহারে। আমার চাকর বলছিল যে আজকাল সাইকেলে কুলোয় না, মোটর সাইকেল দিতে হয় জামাইকে।

শিক্ষা, তা সে সেকালের ইংরেজী শিক্ষাই হোক আর একালের হিন্দী শিখাই হোক, ছাত্রদের পল্লীবিমুখ ও কায়িক শ্রমবিমুখ করে। আর তাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকে পরিণত করে। সেইসঙ্গে এনে দেয় এমন এক স্বাচ্ছন্দ্যের মান যার খরচ

জোগাতে না পেরে তারা ধরে ঘুষ, দাবী করে পণ, অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। রাজেন্দ্রপ্রসাদজী বেঁচে থাকতেই এ পতন শুরু হয়েছিল। দুঃখের বিষয় মুসলিম সমাজেও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথার প্রসারও দেখা যাচ্ছে।

এখনো দুধে হাত পড়েনি। শতকরা সত্তরজন ভারতীয় এখনো নিরক্ষর। তাদের ধরেবেঁধে স্কুলে পাঠাবার পর দেখা যাবে যে তারাও চায় শিক্ষিত ভদ্রলোক হতে, শহরে বাস করতে ও দু' হাতে রোজগার করতে। সে সব পন্থা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে তারাও ধর্মঘট করবে, কাজকর্ম বন্ধ করবে। তাদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা বোমাও কাটাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর হামলাও করবে। পরীক্ষার হলে নকল করার অধিকার দাবী করবে। পাশ সবাইকে করিয়ে দিতে হবে, ডিগ্রী সবাইকে পাইয়ে দিতে হবে, চাকরি সবাইকে জুটিয়ে দিতে হবে। পরে পণ ইত্যাদি ওরা আপনি আদায় করে নেবে।

একই ব্যাপার চলেছে ইউরোপে। সেখানে আর গ্রামে ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। গ্রাম ক'টাই বা আছে! শহর এখন প্রকাণ্ড হাঁ করে গ্রামের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। সেখানে সবাই চায় শহরে বা শহরতলীতে থেকে মোটর হাঁকিয়ে আপিসে বা কারখানায় যেতে, বাড়ী ফিরে টেলিভিসন দেখতে। ওরা উপরি নেয় না, বাড়তি খাটুনির জন্যে ওভারটাইম নেয়। ইউরোপেও আজকাল মাওবাদীর আবির্ভাব হয়েছে। সমাজশুদ্ধ

সবাই বুর্জোয়া হয়ে যাচ্ছে দেখে এরা তাদের উদ্ধার করতে চায়। তা ছাড়া কতক লোক হিপি হয়ে গিয়ে প্রকারান্তরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই বলে যে ধরেবেঁধে স্কুলে পাঠানো, কারখানায় পাঠানো, যুদ্ধে পাঠানো বস্তুগতভাবে লাভজনক হলেও নীতি-গতভাবে লাভজনক নয়। যেখানে কলকারখানা ভিন্ন অন্য জীবনোপায় নেই সেখানে কলকারখানায় সবাই স্বেচ্ছায় যায় না। অনেকে নিরুপায় হয়েই যায়। সেটাও একপ্রকার ধরে বেঁধে পাঠানো। যুদ্ধে তো আইন করে ধরে বেঁধে পাঠানো হয়ই।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যেমন অপরিমিত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সত্র খুলে দিয়েছে তেমনি তার অলিখিত শর্ত হচ্ছে সবাইকে কনফর্ম করতে হবে। এত বেশী কনফর্ম করলে মৌলিকতা বলে কিছু থাকে না। সমাজে বিদ্রোহের কারণ থাকলে ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ওরাই সকলের আগে প্রতিরোধ করে। পঠদ্দশার পর ছাত্ররা সবাই একভাবে না একভাবে নিযুক্ত হয়। জীবিকা সকলেরই জোটে। কিন্তু তাতেও তারতম্য আছে। বিজ্ঞানী বা টেকনোলাজিস্টদের যা কদর সাহিত্যের বা ইতিহাসের বা দর্শনের কৃতী ছাত্রদের তা নয়। সিভিল সার্ভিসে যারা যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশী পায় যারা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে যায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সেদেশেও হালে পানী পায় না। অথচ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর আয় বেড়েই চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে চালও।

আর বড়লোকদের তো কথাই নেই। তা হলে আর সামাজিক সাম্য কোথায় ?

এইসব কারণে সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনেও অনর্থ সৃষ্টি করে। সমাজের কাঠামো পাল্টানো মুখের কথা নয়। যুদ্ধ আর বিপ্লব মিলে সাহায্য না করলে পরিবর্তন যা হয়েছে তাও হতো না। বিপ্লব বলতে শিল্পবিপ্লবও বোঝায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা স্বচ্ছল হলেও সুস্থ নয়। ওরাও বলছে যে ওদের সমাজ অসুস্থ সমাজ। শিক্ষায় তার প্রতিফলন পড়বেই। তা ছাড়া জীবনের সর্বত্র প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাচ্ছে যত লোক হটে যাচ্ছে তার শতগুণ। এই যে 'ইঁদুরের দৌড়' এটা শিক্ষার ক্ষেত্রেও অশান্তি ডেকে এনেছে।

তা বলে আমাদের এদেশের মতো অরাজকতা নয়। আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রকেও করেছে অরাজক। বরঞ্চ আরো কিছু বেশীরকম অরাজক। কেরানীদের তবু একটা ভবিষ্যৎ আছে, ছাত্রদের কী ভবিষ্যৎ? ভালো পাশ করলেও কি ভালো চাকরির স্থিরতা আছে? তা ছাড়া পড়ানো যা হয় তা নমো নমো করে হয়। পরীক্ষাগুলো ভীতিপ্রদ ব্যাপার। ছাত্রদের বেলা যা জীবনমরণ সমস্যা অধ্যাপকদের বেলা তা ছেলেখেলা। খালি ছাত্রদের দোষ দিয়ে কী হবে? শিক্ষকদেরই

অগ্রণী হয়ে ছাত্রদের অন্তর জয় করতে হবে। কিন্তু নাই দিয়ে নয়।

ইউরোপে পরিকল্পিত এই শিক্ষাব্যবস্থা একদা নির্দিষ্টসংখ্যক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ছেলেদের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর যখন ভারতে প্রবর্তিত হয় তখনো তেমনি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রের জন্যেই। কেউ তখন কল্পনা করতে পারেনি যে স্কুলকলেজের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা এত বেশী বেড়ে যাবে। এমন কি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও না। স্যার আশুতোষ তাঁর গ্রাজুয়েট তৈরির কারখানায় যে ওভার-প্রোডাকশন ঘটান অনেকে তার জন্যে তাঁর নিন্দাবাদ করেছে। এখন তো আরো অনেক কারখানা স্থাপন করা হয়েছে কাঁহা কাঁহা মুলুকে। সে সব কারখানা আরো বেশী মাল উৎপাদন করছে। আরো বেশী নিরেশ মাল। হিন্দী বাংলা তামিল লেবেল আঁটা। এই সর্বব্যাপী অতি উৎপাদন রোধ করবে কে? সরকারেরই বা সে সাধ্য কোথায়?

মাও ৎসে তুং এর একটা সমাধান দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁর অনুসরণ করতে যাই ব্যর্থ হব। বিপ্লবী সরকার না হলে অতখানি কঠোর আর কেউ হতে পারে না। হতে গেলে গণেশ ওলটাবে। চেয়ারম্যান মাও শহর পছন্দ করেন না, ভদ্রলোক পছন্দ করেন না, শহুরে ভদ্রলোক উৎপন্ন যাতে হয় তার মূলোচ্ছেদ করতে চান। ছেলেরা চালান যায় গ্রামে আর

সেখানে চাষ করতে করতে শেখে। ঠিক যেন গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা। আমরা গান্ধীকে সরিয়েছি, মাওকে ডেকে আনতে পারিনে। অথচ অরাজকতায় দিশেহারা হচ্ছি। বোমার সঙ্গে মোকাবিলা করার বরাত দিয়েছি পুলিশের উপরে।

তলিয়ে ভাবতে হবে আমাদের। চোখ বুজে পশ্চিমের অনুসরণ করলে চলবে না। একদিন অতি সঙ্গত কারণেই পশ্চিমের পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলুম। সে পদ্ধতি বাতিল করার মতো কারণ দেখছিনে। কিন্তু যে পদ্ধতি সমাজের ক্ষুদ্র একটি স্তরের পক্ষে ভালো সেই পদ্ধতিই যে সর্বসাধারণের পক্ষেও ভালো এ যুক্তি মেনে নিলে কোনো পক্ষেরই মঙ্গল হবে না। যে যেমন শিক্ষার যোগ্য সে তেমন শিক্ষা পাবে। যে কলেজে পড়ার যোগ্য নয় সে কলেজে যাবে না, আর কোথাও যাবে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্য নয় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না, আর কোথাও যাবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ না করে উপায় নেই। যোগ্যতার টেস্ট স্কুলেও প্রয়োগ করতে হবে। যোগ্যাযোগ্য বিনিশ্চয় অপ্রীতিকর। কিন্তু তা না করলে যা হবে তা মাওবাদী ব্যবস্থা। মাঠে ময়দানেই পাঠাতে হবে অধ্যাপক ও ছাত্রদের। আমরা যদি মেরুদণ্ডের পরিচয় না দিই ইতিহাস সেই অভিমুখেই যাত্রা করবে। আজ আমরা নিজেরাই পরীক্ষাধীন। আমার মনে হয় অধিকাংশ ছাত্রকে ষোল বছর বয়সের পর যে কোনো

প্রকার জীবিকায় ভর্তি করে দিতে হবে। উচ্চশিক্ষা তারা চায় তো অবসর সময়ে প্রাইভেট ছাত্র রূপে পাবে।

শিক্ষার আদি উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে জীবিকার্জন। কালক্রমে জ্ঞানার্জনের চেয়ে বড়ো হয়েছে জীবিকার্জন। জ্ঞানবানরা এখন দেশ ছেড়ে বিদেশে প্রস্থান করছেন আরো উপার্জনের আশায়। ইংলণ্ডের বিদ্বানদের লক্ষ্য আমেরিকা। ভারতীয় বিদ্বানদের লক্ষ্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা। এর নাম ব্রেন ড্রেন। একে থামাতে গেলে বহু বিদ্বান ব্যক্তির উপর অবিচার করা হয়। অনেকে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যথাযোগ্য স্থান পেলে থেকে যেতেন। যথাযোগ্য দূরের কথা ন্যূনতম স্থানও পাননি। সেব্যবস্থা এমন সব লোকের হাতে পড়েছে যাঁরা আপন জন ছাড়া আর কাউকে চান না। কাজেই আপনার স্থান খুঁজতে হয় বিদেশে অনাত্মীয় জনদের মধ্যে। মিলেও যায়। আমি এই ব্রেন ড্রেনের নিন্দা করি কোন মুখে! যখন দেখি যে যোগ্যতর উপেক্ষিত হচ্ছে, কম যোগ্য খুঁটির জোরে ঘাঁটি গেড়ে বসছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটা আস্তাবল যাকে সাফ করতে হলে একাধিক হারকিউলিসের দরকার। এই শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় শাসনের আমলে আনলে হয়তো সেটা সুগম হবে। অপর পক্ষে যেখানে যেটুকু ভালো কাজ হচ্ছে কেন্দ্রের চাপে সেটুকুরও ক্ষতি হতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থার স্তরে স্তরে এত অন্যায়, এত অবিচার জমেছে

যে সময়মতো প্রতিকার না করলে এর নৈতিক ভিত্তিটাই ধ্বসে পড়বে। কেবলমাত্র ইনটেলেকচুয়াল প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি নয়। মনুষ্যত্বেরও চাহিদা মেটাতে হবে। মানুষ হিসাবে যে খাটো সে কি মানুষের ছেলেকে মানুষ করতে পারে! আর এই মানুষ করার কথাটাও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল ও প্রায়ই শোনা যেত। বিলেতের ডাক্তার আরনল্ড প্রমুখ প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বকেও যে গুরুত্ব দেন বাংলার রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ প্রধানশিক্ষক তথা অধ্যাপকরাও সেই গুরুত্ব দেন। আধুনিক শিক্ষা বিদেশ থেকে আমদানী করার সময় কিছু পরিমাণে মনুষ্যত্বও আমদানী করা হয়েছিল। সেটা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে এসেছে বলে ভয় হয়। নইলে ছাত্রদের এমন আস্পর্ধা হতো না যে তারা মাস্টারদের অশ্লীলভাষায় গালাগাল দিত, অধ্যাপকদের তুই তোকারি করত।

ছাত্রদের এতকাল নিষ্ঠুরভাবে পেটানো হয়েছে, এবার তাদের হাতে পিটুনি খেতে হচ্ছে। ইতিহাসের পরিহাস। এখন প্রহসনটার ষোলকলা পূর্ণ হয় যদি পুলিশকে এর মধ্যে টেনে আনা হয়। অবশ্য না ডাকলেও আসতে বাধ্য তারা। কোথাও অপরাধ অনুষ্ঠিত হলেই পুলিশকে সেখানে যেতে হয় ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এটা মধ্যযুগও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিও গির্জা বা মন্দির নয়। তা হলেও আমি দুঃখিত।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল আদিমানব আদমকে। নিষেধ অমান্য করে সে আর তার স্ত্রী স্বর্গভ্রষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও তাদের সন্ততি পুরুষানুক্রম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আসছে। এবার স্বর্গে নয়, মর্ত্যে। পাঠশালায়, স্কুল কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন এর পরিণাম কী হয়েছে শুনুন।

এক প্যারিস শহরেই চল্লিশ হাজার পুলিশ চিরস্থায়ীভাবে মোতায়েন হয়েছে, পাছে বিদ্যার্থীরা দু'বছর আগের মতো আবার এক বিপ্লব বাধায়। সেবার পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ ছিল যে পুলিশ খুব মেরেছে। এই দু'বছরে পুলিশের কোনো অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে বলে শোনা যায় না। সে দিন এক ফরাসী ভদ্রলোককে হাতের কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, "ফরাসী বিপ্লবের খবর কী? আবার কবে বাধছে?" হাসিখুশি মানুষটি এতক্ষণ রসিয়ে রসিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান বলেন "আর বাধবে না। পুলিশ ভয়ানক কড়া।"

বাঙালীদের সম্বন্ধে বলা হয় ওরা ভারতবর্ষের ফরাসী। তাই যদি হয় তবে কলকাতা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্যারিস। স্বয়ং লেনিন নাকি একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "বিপ্লব পিকিং

থেকে প্যারিসে যাবে, কলকাতা হয়ে।” তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যে হেসে উড়িয়ে দেবার নয় তা তো আমরা আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। সেইজন্যেই কি কলকাতা শহরে প্যারিসের মতো পুলিশ মোতায়েন শুরু হয়ে গেছে? এটাও কি সেইরূপ এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত?

প্যারিসে ছাত্রবিদ্রোহ অতদূর গড়াত না, যদি না কল-কারখানার শ্রমিকরা তাদের পক্ষ নিয়ে ধর্মঘট করত। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের অনেকরকম সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে। তার ফলে তারা আর ছাত্রদের সঙ্গে গোলে হরিবোল দিতে রাজী নয়। সেদিন একজন প্যারিসের শ্রমিকদের সম্বন্ধে লিখেছেন যে ওরা মোটরগাড়ী টেলিভিসন সেট ইত্যাদি পেয়েছে, ছাত্রবিদ্রোহে ওরা যোগ দেবে না, তবে ওদের নিজেদের স্বার্থে দরকার হলে লড়বে। তার মানে পরের জন্যে ওরা পুলিশের মার খাবে না। খেলে নিজের জন্যে খাবে।

মার্কস মুনির উত্তরসূরী হচ্ছেন মারকুস মুনি। বিপ্লব বাধাবে কেটা, এই প্রশ্নের উত্তর মার্কস দিয়েছিলেন একভাবে, মারকুস দিচ্ছেন আরেকভাবে। মার্কসের আশাভরসা ছিল কলকারখানার শ্রমিকশক্তি। মারকুসের আশাভরসা স্কুল-কলেজের ছাত্রশক্তি।

এখন মুশকিল হলো এই যে ফরাসীরা আগে ভাগে সতর্ক হয়ে নিবারণী ব্যবস্থা করে বসে আছে। পুলিশ সমস্তক্ষণ

বন্দুকের ঘোড়ার উপর আঙুল রেখে তৈয়ার। যাদের হাতে বন্দুক দেওয়া হয়নি তাদের হাতে রবারের ট্রাঞ্চন। বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা আসে, এই মহাতত্ত্ব ওরাও জেনে গেছে। আর ওরাই তো বন্দুকপাণি। গণতান্ত্রিক সমাজে পুলিশকে কড়া হাতে সংযত করাটাই নিয়ম, কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে সংযমের বাঁধ ভেঙে যাবে। যদি পুলিশের উপর বোমা পড়ে বা শহরের শান্তি বিপন্ন হয়।

প্যারিসের মতো শহরেই এই ব্যাপার। আমেরিকার হালচালও ওবই উনিশ বিশ। গণতন্ত্রের নখ আছে, দাঁত আছে। স্বাভাবিক সময়ে সে পোষা বেড়াল। সঙ্কটের দিন বনবেড়াল। তার চোখে ধুলো দিয়ে একদল ছাত্র বা একদল শ্রমিক রাতারাতি বিপ্লব বাধিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নেবে এটা সম্ভবপর নয়। সে তার নখদন্ত ব্যবহার করবেই। করলে যে পরের বার ভোট পাবে না তাও নয়। প্যারিসের ছাত্রবিদ্রোহের পর ফ্রান্সে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে দ্য গলের পার্টিই জয়লাভ করে।

গণতন্ত্রী দেশে অধিকাংশ ভোটদাতার হাতেই ক্ষমতার চাবী। তাদের ভাঁওতা দেওয়া, ভয় দেখানো ইত্যাদি বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হলো তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় ভোটদান। বুলেট নয়, ব্যালট সেখানে নিয়ামক। কেউ যদি বুলেটকেই নিয়ামক ভাবে তবে তাকে পুলিশের সম্মুখীন হতে হবে। তখন আর কান্নাকাটি করা চলবে না যে, "বড্ড লেগেছে।"

যে দেশে গণতন্ত্রের পাট নেই সে দেশে বিদ্রোহ বা বিপ্লব করলে জনসাধারণের অধিকার খর্ব করা হয় না। কিন্তু যেখানে জনগণ ভোটের অধিকার পেয়ে গেছে ও তার ব্যবহারও ভালো করে জেনেছে সেখানে বিদ্রোহ বা বিপ্লব জনগণের হাত থেকে তাদের একটি মূল্যবান অধিকার হরণ করে। ফরাসী নির্বাচক-মণ্ডলী তাই দ্য গলকেই সমর্থন করেছে, তাঁর পার্টির উপরেই শাসনের বরাত দিয়েছে। ছাত্ররা পিটুনি খেলে সরকার জনসাধারণের আস্থা হারাবে না। জনমত সরকারের দিকেই যাবে। মাঝখান থেকে সায়েস্তা হবে ছাত্রের দল। জনতাকে সঙ্গে না নিয়ে ছাত্ররা এগোতে পারে না। অথচ জনতা তাদের সঙ্গে চলতে রাজী নয়।

সবাই আজকাল চালাক হয়ে গেছে। জনতাও কম চালাক নয়। জনতা যদি জানতে চায়, "তোমরা বন্দুকের নলের ভিতর থেকে ক্ষমতা বার করে নিয়ে নিজেরাই ভোগ করবে তো? আমাদের তাতে কী লাভ? এই যে আমরা ভোটাধিকার খাটিয়ে রাজা উজীর মারছি, একদলকে হটাচ্ছি, আরেক দলকে বসাচ্ছি এ অধিকার তো হারাব"—তবে এর কী জবাব দেবে ছাত্ররা?

ছাত্ররা কেউ কাস্তেও ধরবে না, হাতুড়িও ধরবে না, চাষীর মেয়ে বিয়ে করবে না, মজুরের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেবে না। এরা যদি স্বতন্ত্র একটা শ্রেণী হয়ে থাকে তো সেটা যে ক'বছর স্কুল

কলেজে কাটে সেই ক'বছরের জন্যে। তারপরে এদের চাকরি-বাকরি বা ওকালতী ডাক্তারি অনুসারে এদের শ্রেণী নির্ণয় হয়ে যায়। তখন আর ছাত্রশক্তি নয়, উকীলশক্তি বা ডাক্তারশক্তি বা চাকুরে শক্তিই এদের শক্তি। শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে এইসব মধ্যবিত্তঘরের চাকুরে বা ডাক্তারদের এমন কী চিরস্থায়ী সম্পর্ক আছে যে এদের জন্যে শ্রমিক তার জীবিকা বিপন্ন করবে বা কৃষক তার প্রাণ বিপন্ন করবে?

এটা একপ্রকার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। কদাচ কখনো ছাত্রদের সঙ্গে শ্রমিকরা বা কৃষকরা একই আসরে নামতে পারে, কিন্তু কাজ ফুরোলেই যে যার নিজের স্বার্থ বুঝে নেয়। স্বার্থে স্বার্থে বিরোধও বাধতে পারে। ছাত্ররা স্বতন্ত্র একটা শ্রেণীও নয়, তারা যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সে শ্রেণী ক্ষণকালের জন্যে সংগ্রামীর খাতায় নাম লেখালেও তার স্বার্থ শ্রমিক স্বার্থ বা কৃষক স্বার্থ নয়। শ্রেণীযুদ্ধ যদি সত্যি সত্যি বাধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাও কাটা পড়বে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে তাদের বাপ খুড়োরা শত্রু হলেও তারা শত্রু নয়, মিত্র। তাদের আত্মীয়গোষ্ঠী দৈত্যকুল হলেও তারা এক একটি প্রহ্লাদ। যেহেতু তারা ছাত্র। ছাত্রই বা কেমন করে তাদের বলা হবে যখন তারা ভুলেও পড়াশুনা করে না, কলেজে গেলে পড়াশুনার জন্যে যায় না, যায় ঝগড়া করতে, তাণ্ডব নাচতে!

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ছাত্রদের নিজস্ব কয়েকটি

সমস্যা আছে যার জন্যে তারা অশান্ত। ছাত্র অশান্তি যেমন করে হোক দূর করতেই হবে। দূর করবে সমাজ, করবে রাষ্ট্র। কিন্তু নিজস্ব সমস্যা আছে বলেই তারা শ্রেণীযুদ্ধ বা বিপ্লব করবে এটা একটা উৎকট দাবী। দাবী যদি ন্যায্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে কারো কাছে সহানুভূতি পাবে না। তাদের শ্রেণী-মিত্তারাও একদিন তাদের পরিত্যাগ করবে। তখন মোহভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষার পুনর্গঠন ফ্রান্সে অত্যাবশ্যক হয়েছিল। ছাত্র-বিদ্রোহের ফলে পুনর্গঠনের দিকে সরকারের ও সমাজের নজর পড়েছে। ছাত্রবিদ্রোহ সে-হিসাবে ব্যর্থ হয়নি। এটাও সত্য যে সমাজের তথা রাষ্ট্রের পুনর্গঠন খুব বেশীদূর যাবে না! ছাত্ররা আবার বিদ্রোহী হবে। অপর পক্ষে এটাও মনে রাখতে হবে যে ফ্রান্সের মতো রক্ষণশীল সমাজ ছাত্রদের ভয়ে ভীত হবে না। এসব হলো সামঞ্জস্যের ব্যাপার। সামঞ্জস্য রাতারাতিও হয় না একতরফাও হয় না। যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাদের স্বার্থও বিবেচনা করতে হবে। তাদের স্বার্থ তারা অংশত ছাড়তে পারে, সম্পূর্ণ ছাড়বে না। শিক্ষাসংস্কার তাই কিস্তিবন্দীভাবে হতে পারে, সমাজের পরিবর্তনও তেমনি দফায় দফায়। বিপ্লব এর নাম নয়।

সমাজটা পচনধরা বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল, অতএব ছাত্রদের উপরেই ইতিহাস বরাত দিয়েছে যে তোমরাই এ-যুগে বিপ্লব

আদি ঘটাবে, এটা একটা মোহ। যারা পড়াশুনায় ভালো তাদের মধ্যেই এ মোহটার প্রাদুর্ভাব বেশী। কারণ তারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে। আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের সেরা ছেলেরাই নাকি ছাত্রশক্তির বৈপ্লবিক ভূমিকায় নিঃসন্দেহ। এতদিন পর্যন্ত আমাদের জানা ছিল যে বেশী পড়াশুনা করলে মানুষ সংশয়বাদী হয়, মানুষের ঝোঁকটা যায় তর্কে বিতর্কে। এখন দেখা যাচ্ছে মানুষ অন্ধবিশ্বাসীও হয়। বিশ্বাসে মিলায় বিপ্লব, তর্কে বহুদূর।

এর মধ্যে ভরসার কথা এই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হামলার ভয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানবৃক্ষ থাকলে তো ছেলেরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করবে। আমাদের এই গরীব দেশে আমরা এক কলকাতা শহরেই চল্লিশ হাজার পুলিশ মোতায়েন করতে পারব না তার চেয়ে পড়াশুনার পাট একেবারেই তুলে দেব। যার ইচ্ছা সে ঘরে মাস্টার রেখে পড়বে। অধ্যাপকরা সেইভাবেই প্রতিপালিত হবেন। যারা উদ্যোগী পুরুষ তাঁরা টিউটোরিয়াল হোম খুলে অধ্যাপনা চালাতে পারেন। সেকালের চতুষ্পাঠীর আধুনিক সংস্করণ। তারপর কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি উপাধি বিতরণ করতে পারেন। তার জন্যে পরীক্ষার কী দরকার? পরীক্ষা পণ্ড করারও প্রয়োজন হবে না।

এখানে বলে রাখি যে সব দেশে শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্তনশীল। কোথাও বৈপ্লবিক নয়। ছাত্রদের হাতে বিপ্লবের ভার কেউ

দেয় না। এমন কি রুশ চীনও না। ছেলেরা আগে পড়াশুনা করবে, তার পরে কাজকর্ম করবে, কেউ কেউ রাজনীতিতে যোগ দেবে। সে রাজনীতি কোন কোন দেশে বৈপ্লবিক। আমাদের এদেশে আধা-বৈপ্লবিক। কিন্তু পড়াশুনা ছেড়ে কাজকর্ম ছেড়ে কেবলমাত্র বৈপ্লবিক রাজনীতি নিয়ে থাকা কোথাও কখনো লক্ষ লক্ষ ছাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। ইতিহাসে আর কোথাও এর নজীর নেই।

সুতরাং ছাত্রশক্তি বলে সম্প্রতি যে তত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছে সে তত্ত্ব ভিত্তিহীন। তার পেছনে সত্য যদি কিছু থাকে তবে সেটা এই যে ছাত্রদের আসরে নামতে দেখে শ্রমিকরাও আসরে নামবে, তা দেখে কৃষকরাও নামবে। কিন্তু শ্রমিকরা যদি সরে দাঁড়ায় তা হলে কী হবে? ছাত্রদের নিজেদের দৌড় কতদূর?

বিপ্লবের দাবী নিয়ে আসরে নামা প্যারিসে বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোথাও বিপ্লবের ডাকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বিপ্লব ছাড়া আরো একটা জিনিস আছে। বিবর্তন। বিবর্তন কোনোখানেই বন্ধ হয়ে যায়নি, বন্ধ হতে পারে না, বিবর্তনের উপর যাদের আস্থা আছে তারা সব দেশেই সব সময় সক্রিয়।

ভারত বিবর্তনের পথ বেছে নিয়েছে। এ পথ বিপ্লবের মতো রাতারাতি ফল দেয় না। সেই কারণে এ পথ মনকে নাড়া দেয় না, যৌবনকে দোলা দেয় না। কিন্তু এ পথ প্রতিবিপ্লবের বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচায়। বিপ্লব হলে প্রতিবিপ্লবও

অবশ্যম্ভাবী। গৃহযুদ্ধ তো বাধবেই, বিদেশী সৈন্যরাও এসে ঘাঁটি গেড়ে বসবে। যারা এদেশকে ভিয়েৎনামে পরিণত দেখলে খুশি হয় তারা কি কল্পনা করতে পারে না যে, এই কলকাতা শহরই একদিন বিদেশী ঘাঁটি হবে?

বাস্তববাদী যাঁরা তাঁরা সকলেই জানেন যে বিপ্লবের পরের দিন প্রতিবিপ্লবও হবে আর উভয়ের মল্লযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের মহতী বিনষ্টি ঘটবে। সেই মহতী বিনষ্টিও একপ্রকার জুয়াখেলা। খেলার শেষে হয়তো দেখা যাবে যে প্রতিবিপ্লবই জয়ী হয়েছে। অমন করে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়ে জুয়াখেলার অধিকার কি কোনো একটি দলের বা কোনো একটি শ্রেণীর আছে? অবশ্য এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ একভাবে না একভাবে মরবেই। তেমন এক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে বিপ্লবও একটা বিকল্প। জাপান যেদিন বর্মা দখল করে ভারতের দিকে পা বাড়ায় সেদিন যদি আমাদের বিপ্লবীরা বিপ্লব বাধাতেন তা হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরত, কিন্তু সে মরণ অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া সহজ হতো। আমার জীবনে সেই একটিবার আমি সত্যিকার বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। সেদিন এগিয়ে আসেন গান্ধীজী। মার্কস্ কিংবা মারকুস না।

তেমন একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে হাতছাড়া হতে দিয়ে অসময়ে বিপ্লবের আবাহন করলে কি বিপ্লব আসবে? যদি

আসেই তবে প্রতিবিপ্লবও আসবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরণের মুখে দাঁড়াবে। তখন কে জানে তারা কোন্ দিকে ঝাঁপ দেবে! প্রতিবিপ্লবের দিকেও ঝাঁপ দিতে পারে। যদি তাতে প্রাণ বাঁচে। এত বড়ো একটা দেশের সমস্তটাই রাতারাতি লাল হয়ে যাবে না। মানচিত্রের কতক অংশ লাল হলেও বাকী অংশ হলদে কালো হওয়া সম্ভবপর। পশ্চিমবঙ্গ কোণঠাসা হয়ে বেশী দিন বিপ্লব রক্ষা করতে পারবে না। যদি না চীন সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে ও সে-আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য হয়। তেমন কিছু ঘটলে অন্যরাও আক্রমণ করবে ও দেশ হবে যুদ্ধক্ষেত্র। ভগবান আমাদের সুমতি দিন।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে বিবর্তিত হয়নি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়েছে। প্রবর্তকদের মধ্যে যেমন বেসরকারী ইউরোপীয়রা ছিলেন, তেমনি ছিলেন যুগ সচেতন ভারতীয়রা। সরকার এ বিষয়ে মনঃস্থির করবার পূর্বেই পাশ্চাত্য স্কুল কলেজ বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়।

সেকালে হিন্দুর ছেলেরা যেত পাঠশালায়, তার পরে তাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য তারা যেত চতুষ্পাঠীতে বা টোলে। আর মুসলমানের ছেলেরা যেত মক্তবে, তার পরে মাদ্রাসায়। মুসলমানদের মক্তব ও মাদ্রাসার দুয়ার হিন্দুর ছেলেদের জন্যে খোলা থাকত। তারা আরবী ফারসী শিখে সরকারী চাকরির শরিক হতো। এইরূপ উদারতা হিন্দু শিক্ষায়তনগুলির ছিল না। মুসলমানদের প্রতি উদার হওয়া দূরে থাক হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের উপর তারা উদার হয়নি। পাঠশালা অবধিই ছিল তথাকথিত নিম্নবর্ণের দৌড়।

মুসলমানরা উদার হলেও তাদের মাদ্রাসা ও মক্তবগুলিতে যা শেখানো হতো তা টোল চতুষ্পাঠীগুলির মতোই সেকেলে। নতুন বিদ্যা, নতুন জ্ঞান, নতুন চিন্তা, নতুন বিচার তাদের কাছে তেমনি বর্জনীয় ছিল যেমন হিন্দুদের কাছে। শিক্ষার সুযোগ

যারা পেতো তারা মধ্যযুগেই নিঃশ্বাস নিত, আধুনিক যুগে নয়। অথচ আধুনিক যুগ ইউরোপে আরম্ভ হয়ে যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই। তার মানে চার শতাব্দী কাল ভারতের টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসা ইমামবাড়া মধ্যযুগেরই মানসলোকে অবস্থান করছিল।

পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসা ইমামবাড়াকে আধুনিক শিক্ষার আয়তনে পরিণত করা কারো সাধ্য ছিল না। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষার আয়তন হিসাবে পাশ্চাত্য আদর্শের স্কুল কলেজ প্রবর্তন করাই শ্রেয় বিবেচিত হয়। যার ইচ্ছা সে প্রাচীন আদর্শের শিক্ষায়তনে যাক, যার ইচ্ছা সে আধুনিক আদর্শের শিক্ষায়তনে যাক। এই মনোভাব পরে সরকারী নীতিতেও প্রতিফলিত হয়। সরকার প্রাচীন-পন্থীদের জন্যে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কলকাতার হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সরকার নন, বেসরকারী ভারতীয় ও ইউরোপীয়রা। সরকারের শিক্ষানীতি পাশ্চাত্য আদর্শের দিকে মোড় নিতে আরো সময় লাগে।

সরকারের পক্ষপাত গোড়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার উপর তো ছিলই না, বরঞ্চ তার বিপরীত। সরকারী মহলের মতে ভারতীয়দের পক্ষে ভারতীয় ব্যবস্থাই ভালো, নইলে খরচ বাড়ে। পাশ্চাত্য ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল। তা ছাড়া পাশ্চাত্য

আলোক পেয়ে তো পেট ভরবে না, বিদ্যার্থীরা দু'দিন বাদে কর্মপ্রার্থী হবে। তাদের জন্যে তো ইংরেজরা নিজ নিজ পদ ছেড়ে দেবে না, নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে। তার প্রয়োজন কোথায়? সঙ্গতিই বা কোথায়? দিতে পারা যায় এক কেরানীর পদ। তার জন্যে না হয় গোটাকতক স্কুল খুলে দেওয়া যাবে, কিন্তু কলেজ কেন? কলেজের পড়ুয়াদের অভুক্ত রাখলে তারা কি অশান্ত হবে না।

সরকার পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করে দেশীয়দের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করেন। পরে সরকারের বিভাগ সংখ্যা বেড়ে যায়। ডাকঘর প্রভৃতির জন্যে লোকের দরকার হয়। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যেসব উদ্ভাবন ইউরোপের চেহারা বদলে দেয় ভারতেও তাদের প্রবর্তন হয়। রেল, স্টীমার, ট্রাম, টেলিগ্রাফ কলকারখানা কয়লার খনি, ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রভৃতি মিলে দেশের চেহারা বদলে দিলে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়।

কাজেই যথাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয়। ও জিনিস ভারতবর্ষে কোনো এক কালে ছিল, কিন্তু নালন্দা ও বিক্রমশিলার পতনের পর অন্তর্হিত হয়। আধুনিক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় তা ধর্মের আঁচলঘোঁষা নয়, বরং তার বিপরীত। ধর্ম আর দর্শন একই বিষয় নয়, এই উপলব্ধি আসে ষোড়শ শতাব্দীতে। থিওলজির চেয়ার থেকে স্বতন্ত্র এক

চেয়ার সৃষ্টি হয়। সেটা ফিলসফির চেয়ার। একবার ফিলসফিকে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দেবার পর থিওলজির চেয়ে ফিলসফিই হয়ে ওঠে আরো আকর্ষণীয় বিষয়। ফিলসফির থেকে আসে ন্যাচারাল ফিলসফি বা সায়েন্স। সায়েন্স ক্রমে ক্রমে বহুভাগে বিভক্ত হয়। যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিজ্ঞানের অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে থিওলজিও থাকে, তবে উনবিংশ শতাব্দীতে যখন রাষ্ট্রের উপরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায় উত্তরোত্তর বর্তায় তখন রাষ্ট্র বিশেষ কোনো একটি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হতে কুণ্ঠিত হয়। যে যার সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় হবে অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ। সেখানে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়াবাদীও পড়তে বা পড়াতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি রাষ্ট্রীয় হয় তো তার ছাত্র ও অধ্যাপকদের ধর্মমতে বা বিবেকে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। ইউরোপে এসব পরিবর্তন একদিনে আসেনি, আসতে বহু শতাব্দী লেগেছে।

ভারতে যখন পাশ্চাত্য আদর্শের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন উনবিংশ শতাব্দী তার মধ্যগগনে। এ শতাব্দী শিক্ষাকে ধর্মের আঁচলমুক্ত করে দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথে। তারপর তাকে করে বহুজন হিতায় চ।

মুষ্টিমেয় ধর্মযাজক বা অভিজাত সন্তানের জন্যে নয়, তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী অথচ অন্যের চেয়ে সংখ্যায় কম। উচ্চমধ্যবিত্তের জন্যেও নয়। সাধারণের জন্যে। এমন কি শ্রমিক কৃষকদের জন্যেও। তবে কার্যত সাধারণ বলতে বোঝায় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। এদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, এরাই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ভরিয়ে ফেলে। শতাব্দীর শেষে দেখা যায় ভারতেও সেই একই অবস্থা। শিক্ষায়তনগুলি মধ্যবিত্তদের দিয়ে ঠাসা। ইংরেজী মাধ্যমের কঠোর প্রতিবন্ধককেও তারা অতিক্রম করেছে। সেটা যদি না থাকত, তার বদলে থাকত মাতৃভাষার মাধ্যম তা হলে আরো অনেক বেশী স্কুল কলেজ স্থাপন করতে হতো, আরো বেশী পড়ুয়া বেকার হতো। তাদের সকলের জন্য কর্মসংস্থান সম্ভব হতো না।

মাতৃভাষার মাধ্যম আগেকার দিনে ইউরোপেও ছিল নাকি? না, লাটিন ছিল শিক্ষার মাধ্যম ইউরোপের সর্বত্র। জার্মানরা জোর করে মাতৃভাষা চালিয়ে দেয়। তারপর থেকে ফরাসী প্রভৃতি জাতে ওঠে। তার জন্যেও কয়েক শতাব্দী লেগে যায়। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব এর একটা কারণ। সব শিক্ষায়তনে একই রকম স্ট্যাণ্ডার্ড চাই, এটাও অরেকটা কারণ। ইউরোপের এক দেশের ছাত্র অন্যান্য দেশে গিয়ে পড়াশুনা করত, অধ্যাপকরাও ঘুরে ঘুরে পড়াতেন। লাটিন মাধ্যম ছিল বলেই এটা সম্ভব ছিল। মাতৃভাষা মাধ্যম হওয়ায় ছাত্রদের বিদেশ যাত্রা কমে যায়,

অধ্যাপকরাও স্বদেশে আবদ্ধ হন। এতে ইউরোপীয় মানসিকতা হ্রাস পায়, তার বদলে আসে জার্মান বা ইংরেজ বা ফরাসী মানসিকতা। ফলে ইউরোপের যেটুকু ঐক্য ছিল সেটুকুও বিপন্ন হয়।

একই সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এদেশে। হিন্দীভাষীরা জোর করে হিন্দী মাধ্যম চালিয়ে দিয়েছে। তামিলভাষীরা পেছিয়ে থাকছে না। বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি কেউ বাদ দিচ্ছে না। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব না থাকলে এ প্রক্রিয়া আরো দ্রুত হতো। কিন্তু এর নীট ফল হবে ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক প্রদেশ থেকে অপর প্রদেশে যাওয়া বন্ধ। যদি না ইংরেজী মাধ্যমও সঙ্গে সঙ্গে চলে বা হিন্দী মাধ্যমও সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হয়। ভারতের ঐক্যের খাতিরে হিন্দীর প্রয়োজন যদি থাকে ইংরেজীরও প্রয়োজন থাকবে, কারণ ইংরেজী মাধ্যমে যত কিছু শেখা যায় হিন্দী মাধ্যমে ততকিছু নয়।

জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়নোর সাধ্য ভারতের ক'টা ভাষারই বা আছে! পাঠ্যপুস্তক ফী বছরই বাসি হয়ে যায়। এত বই লিখবেই বা কে, ছাপবেই বা কে, কিনবেই বা কে? মাতৃভাষার পক্ষপাতীরা যদি এসব প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন তবে মাতৃভাষার দৌড় উচ্চতম স্তরে পৌঁছনোর আগেই থেমে যাবে। তা না হলে যা হবে তা নিচু মানের শিক্ষা। যারা ডিগ্রী পাবে তাদের ডিগ্রীর মান থাকবে না।

ইতিমধ্যে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর ছেলেরাও, সমস্ত শ্রেণীর মেয়েরাও শিক্ষায়তনে প্রবেশ করেছে। তাদের নিষেধ করাও যায় না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যেমন সর্ব বিদ্যা বোঝায় তেমনি সর্বজন যার অধিকারী সে বিদ্যাও বোঝায়। আগেকার দিনে অধিকাংশ মানুষকে অনধিকারী বা নিম্ন অধিকারী বলে বাইরে রাখা হয়েছিল। একালের শ্রীক্ষেত্রে সকলেই সম অধিকারী। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এখনো কতক লোক অচ্ছুৎ। তাদের প্রবেশ মানা। কিন্তু পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সকলের কাছেই মুক্তদ্বার। কিন্তু তার দুটি শর্ত। প্রত্যেককে পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে দরজা বন্ধ। পড়াশুনার ব্যয় বহন করতে হবে। না পারলে ছাত্রবৃত্তি জোগাড় করতে হবে। না পারলে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি বাকরি জোটাতে হবে। না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান হবে না। অত্যন্ত নির্মম শর্ত।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দুনিয়ার সব দেশেই। তা সত্ত্বেও যারা বাইরে থেকে যাচ্ছে তাদের জন্যে রেডিও টেলিভিসন বা করেসপণ্ডেস কোর্স প্রবর্তিত হচ্ছে। বাড়ী বসেই উচ্চশিক্ষা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। যারা ডিগ্রী চায় তারা পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রীও পাচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমরা শুধু ডিগ্রীর জন্যে যাইনে। যাই বড়ো বড়ো অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসে তাঁদের দীপশিখা থেকে

আমাদের দীপগুলি জ্বালিয়ে নিতে। যাই সমবয়সীদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের কাছ থেকেও কিছু শিখতে ও তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করে নিতে। যে ক'টি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটাই সে ক'টি বছর জীবনের স্মরণীয় সময়। জীবিকার জন্যে একটা ছাপ চাই, এটা সত্য। কিন্তু আরো বড়ো সত্য, জীবনের জন্যেও একপ্রকার প্রস্তুতি চাই যা বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন আর কোথাও হয় না। একদিন হয়তো জীবিকার জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা হবে, যেমন কারিগরি শিক্ষায়তন। সেইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে চাপ কমবে। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের আকর্ষণ কমবে না। জীবনের সিংহদ্বার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়।

বিত্তের জন্যে বিদ্যা নয়, বিদ্যার জন্যেই বিদ্যা। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি এটা স্বীকৃত হয়ে এসেছে। ঋষিদের আশ্রমে যারা যেত তারা বিদ্যার জন্যেই যেত, বিত্তের জন্যে নয়। সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ বাড়ীতে যারা যেত তারাও যেত বিত্তের জন্যে নয়, বিদ্যার জন্যেই। পণ্ডিতদের টোল চতুষ্পাঠীতে যারা যেত তাদেরও ছিল বিদ্যার উপরে দৃষ্টি। এটা কেবল ভারতের নয়, ইউরোপেরও ঐতিহ্য। ইউরোপে যখন বিদ্যার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাস্থানেরও বিবর্তন হয়, স্কুল কলেজ তথা ইউনিভার্সিটিতে ধর্মের পরিবর্তে মানবিকতার সঞ্চার হয়, বিদ্যার্থীদের পঠনীয় হয় গ্রীক সাহিত্য দর্শন রাজনীতি প্রভৃতি উপেক্ষিত বা অবজ্ঞাত

বিষয়, শিক্ষণীয় হয় আধুনিক বিজ্ঞান তখনো সেই ঐতিহ্যের জের টেনে চলা হয়। যে ঐতিহ্যের মূলকথা বিদ্যার জন্যেই বিদ্যা।

অথচ এটাও সকলের জানা যে অধ্যয়নপর্ব শেষ হলে অর্জন-পর্ব শুরু হয়। আগেকার দিনে যাকে বলত ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য এখনকার দিনে তাকে বলে শিক্ষার পর জীবিকা বা কেরিয়ার। এমন কোন্ ছাত্র আছে যে সারাজীবনটা জ্ঞানাঙ্গনেই কাটিয়ে দিতে চায়, একদিন না একদিন কর্মাঙ্গনে প্রবেশ করতে চায় না? যারা জ্ঞানাঙ্গনেই থেকে যেতে চায় তারাও চায় অধ্যয়ন থেকে অধ্যাপনা। অন্ততপক্ষে ফেলোশিপ। একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য ভাবনা যদিও বিদ্যার সংরক্ষণ, বিকাশ ও দান তা হলেও গৌণ ভাবনা হচ্ছে বিদ্যার্থীদের জীবিকার ক্ষেত্রে যা কাজে লাগতে পারে তেমন কিছু জোগানো। তেমন কিছুর অন্য নাম হচ্ছে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট। অতি বড়ো বিদ্বানকেও লোকে বিদ্বান বলে স্বীকার করবে না যদি না তাঁর গলায় থাকে একগাছা পৈতে। অর্থাৎ ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট। একালে এইটুকু পরিবর্তন হয়েছে যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো বিদ্যার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে উপবীত গ্রহণ করতে পারে, যদি পরীক্ষায় সফল হয়।

পরীক্ষা বলে এই যে আপদটি এটি মানব ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত নতুন। তবে একেবারে অজানা নয়। ক্ষত্রিয়দের জন্যে ছিল অস্ত্রপরীক্ষা। ব্রাহ্মণদের নানাভাবে গুরুর মনস্তুষ্টি

বিধান করতে হতো। মহাভারতে সে সব উপাখ্যান আছে। কারিগর শ্রেণীর ছেলেরাও শিক্ষানবীশী করে হাতের কাজের পরীক্ষা দিত। একেবারে আনাড়ি কেউ নয়, চাষীর ঘরের ছেলেরাও নয়। কিন্তু ইদানীং একটা ধুয়ো উঠেছে যে পরীক্ষা বলে একটা আপদ আদৌ থাকবে না, থাকলে সেটা হবে নামে মাত্র পরীক্ষা। তাও একজন আধজনের ক্ষেত্রে নয়, শত সহস্র বিদ্যার্থীর ক্ষেত্রে। এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা না হলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে। যারা তৃতীয় বিভাগেও পাশ করার যোগ্য নয় তাদের জন্যে কলেজের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যারা পাশ কোর্সের গ্রাজুয়েট হবারও অযোগ্য তাদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সেখান থেকে একটা ছাপ নিয়ে বেরিয়েই বা তারা করবে কী? কর্মক্ষেত্রে তাদের ক'জনেরই বা সুবিধা হবে? মাঝখান থেকে ডিগ্রীর কদর কমে যাবে। সত্যিকার বিদ্বান যারা তাদের বাজারদর নেমে যাবে।

সমস্যাটা কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, কেবল ভারতেও নয়, প্রায় সব দেশেই দেখা দিয়েছে। সেদিন তান্‌জানিয়া ফের্তা এক অধ্যাপকের মুখে শুনলুম সেদেশে চমৎকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা পাঁচশো অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না। বলা বাহুল্য সেই পাঁচশো জনকে পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। তা হলে আদ্য পরীক্ষার ফলাফলের উপরেই উচ্চতর শিক্ষা নির্ভর করছে। অন্ত্য পরীক্ষার উপরেই নির্ভর

করছে বড়ো বড়ো চাকরি। শতখানেক বছর আগে এদেশেও সেই রীতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত্য পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতো তারা অল্প সংখ্যক ছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো চাকরি পেয়ে যেত। আর নয়তো ওকালতী বা শিক্ষকতা করত।

সরকারী চাকরি, ওকালতী প্রভৃতির সংখ্যা ও আয় চিরকাল সমান থাকে না। একদা হয়তো সকলের জন্যে যথেষ্ট পরিসর ছিল, এখন তা নেই। হয়তো সমাজের পরিবর্তনের ফলে আবার যথেষ্ট পরিসর জুটবে! সমাজতন্ত্রী দেশগুলি সেরূপ আশা দিচ্ছে। তাদের দেখাদেখি ধনতন্ত্রী দেশগুলিও অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করছে। সমস্যাটা এক এক দেশ এক এক ভাবে সমাধান করছে। চীনদেশে তো শুনছি বছর তিনেক আগে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝড়ে সব ক'টা বিশ্ববিদ্যালয়ই দরজা বন্ধ করেছে। এখন আবার একে একে খুলছে। কিন্তু নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে তার আগে তিন বছর থেকে পাঁচ বছর হয় কৃষিক্ষেত্রে নয় কলকারখানায় হাতে কলমে কাজ করা চাই। বুদ্ধিজীবী বলে কাউকে রেয়াৎ করা হবে না। মান্দারিন নামক সেই যে শ্রেণীটা সারা ইতিহাস জুড়ে চীনদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেটাকে চাষী মজুরের সমান স্তরে নামিয়ে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা হবে। সে প্রতিযোগিতায় চাষী মজুরদেরই জিৎ হবে।

ইতিহাস কোন্ দিকে যাচ্ছে তা যদি মনে রাখি তো সময়ে

সাবধান হব। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যদি আপনার ভাবে আপনি ভেঙে পড়ে তা হলে তার শূন্যতা পূরণের জন্যে এবার প্রবর্তিত হবে পাশ্চাত্য নয়, চৈনিক শিক্ষাব্যবস্থা। পূর্বেও আমাদের দেশে একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, নইলে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতোই বা কেন? নালন্দা বিক্রমশীলার ধ্বংসের ইতিবৃত্ত আমরা ঠিক জানিনে। তবে সেখানকার ছাত্রদের সংখ্যা এত বেশী ছিল আর তাদের খাওয়া পরার এমন এলাহী বন্দোবস্ত ছিল যে চারদিকে অবস্থিত শত শত গ্রামকে তার জন্যে দোহন করা হতো। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির মতো সেগুলিও ছিল শোষণমূলক। মধ্যযুগের মঠবাড়ীও তাই। বৌদ্ধ শাসনের পর যখন মুসলিম শাসন আসে তখন সে ব্যবস্থা আপনি রহিত হয়ে যায়। চীনদেশেও শাসন পরিবর্তনের ফলে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এদেশেও হতে পারে।

বিদ্যার অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় যারা নিযুক্ত সব দেশে ও সব যুগেই তারা ছিল ও থাকবে। জ্ঞান বিনা কোনো সমাজ সভ্য সমাজ হতে পারে না, জ্ঞানের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। সেইজন্যে সব সমাজেই এমন কতক লোক থাকে যাদের কাজ হচ্ছে লব্ধ জ্ঞানের সংরক্ষণ, বিকাশ ও বিতরণ। অমনি করে একের জ্ঞান অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এক পুরুষের জ্ঞান অপর পুরুষের মধ্যে। অমনি করে জ্ঞানের পরম্পরা অভগ্ন হয়। তারপর আরো একটি কাজ তাদের উপর বর্তায়। সমাজকে

নেতৃত্ব দিয়ে নতুন নতুন আন্দোলনের জন্ম দেওয়া। মধ্যযুগের ইউরোপে এঁরা না থাকলে রেঁনেসাঁস হতো না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে এঁরা না থাকলে এনলাইটেনমেন্ট হতো না। ফরাসী বিপ্লবটাই হতো না। এদেশেও সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যে জাগরণটি ঘটেছে সেটির মূলেও এঁরাই। সুতরাং এই শ্রেণীটিকে মান্দারিন বলে বা বুর্জোয়া বলে নিপাত করা বা কায়িক শ্রমের প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে বাছাই করা সমাজের পক্ষে শ্রেয় নয়।

অথচ এটাও তো শ্রেয় নয় যে চার পাঁচ বছর বয়স থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষকে উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রেখে অপরের উৎপাদনভোগী করে তোলা হবে। বিদ্যার্থীর সংখ্যা যেখানে পাঁচশো হলে সমাজের ক্ষতি হয় না সেখানে পাঁচ লাখ হলে নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়। এই পাঁচ লাখ কি সত্যিই জ্ঞানের জন্যে এসেছে, না উপবীতের জন্যে, উপবীত দেখিয়ে মোটা দক্ষিণার জন্যে? এদের বিরাট বোঝাটি তো শেষপর্যন্ত পড়ে চাষী মজুর কারিগরের ঘাড়ে। তারাই বা সহ্য করবে কেন? তাদের স্বার্থ প্রাথমিক শিক্ষা, বড়জোর মাধ্যমিক শিক্ষা। উচ্চতর শিক্ষায় তাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ কতটুকু? যদি না তাদের ছেলেরা উচ্চাভিলাষী হয়।

উপভোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন যদি ক্রমাগত বাড়তে না থাকে তা হলে শিক্ষাবিস্তারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম

শিক্ষিত বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি ও যারা বেকার হতে বাধ্য তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বৈনাশিকতা। দুর্গতি থেকে আসে দুর্মতি, দুর্মতি থেকে দুর্গতি। এটা একপ্রকার দুষ্ট বৃত্ত। এতে বেকারদেরও আখেরে মঙ্গল হবে না। একদিন দুষ্ট বৃত্ত ভেদ করতে হবেই। চীনের চেয়ারম্যান তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। ভারতের মহাত্মা গান্ধী দেখিয়েছিলেন অপর এক দৃষ্টান্ত। তাঁর আশ্রম ছিল মধ্যযুগের সাধুসন্তদের মঠবাড়ীর মতো। জাপানে একটি জেন (Zen) বৌদ্ধ মন্দিরে আমাকে যে পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার প্রত্যেকটি শিলা মঠাধ্যক্ষের স্বহস্তে খচিত। যখন তিনি বয়সের ভার আর বইতে পারছেন না তখনো সমানে কাজ করে যাচ্ছেন দেখে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। তাতে ব্যর্থ হলে তাঁর হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখেন। তখন তিনি অনশন শুরু করে দেন। বলেন, "না কাজ তো না আহার।" শিষ্যরা তাঁকে তাঁর হাতিয়ার ফিরিয়ে দেন। তিনিও জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত অন্ন উপার্জন করে যান। খ্রীস্টানরা একে অন্নশ্রম বলে অভিহিত করেন। গান্ধীজীও তাঁর জীবনের শেষদিনটিতেও অন্নশ্রম করে গেছেন। তাঁর অন্নশ্রম চরকা কাটা। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তার হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও জ্ঞানের ঐতিহ্য রক্ষা করে এসেছে, কিন্তু কর্মের থেকে বিযুক্ত হলে তার পতন অনিবার্য। কর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতেও পারে না।

সবাই যদি শিক্ষিত হতে গিয়ে নিষ্কর্মা হয় তবে তো সমাজেরও পতন ঘটবে। শিক্ষাসূত্রে সবাইকে ডাক দিয়ে তা হলে কি আমরা নৈষ্কর্ম্য ডেকে আনব? নৈষ্কর্ম্য থেকে নৈরাজ্যও আসবে। তার সূচনা দেখা যাচ্ছে। তরুণরা চায় অ্যাকশন। সেটাও একপ্রকার কর্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ যদি অ্যাকশনের ময়দান হয় তবে জ্ঞান তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাবে। অপর পক্ষে মানুষের স্বাভাবিক কর্মস্পৃহাকেও সব বয়সেই পরিসর দিতে হবে। কোনো বয়সই বাদ যাবে না। একদিক থেকে যে একজন ছাত্র আরেকদিক থেকে সে একজন তরুণ। সে একজন নাগরিক। সে সমাজের একজন। তার সমস্ত সময়টা বিদ্যাচর্চায় অতিবাহিত হয় না, বিশ্ববিদ্যালয় তার কাছে তত বেশী দাবীও করে না। তা হলে তার বাকী সময়টা নিয়ে সে করবে কী, যদি শ্রমসাধ্য কায়িক কর্ম পরিহার করে? আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মকে বাদ দিয়েও চলতে পারে, কিন্তু কর্মকে বাদ দিলে অচল হয়ে উঠবে। এই রাষ্ট্র একদিন শ্রমিকের হাতে আসবেই। তারা সবাই যখন বাবু হতে চাইলেও বাবু হতে পারবে না, অনেকেই বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করবে, তখন বাবুদেরই টেনে নামাবে ও কিষাণ মজদুর বানাবে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মর্মই ওই। তোমরা আমাকে বাবু হতে দেবে না। আচ্ছা, দাঁড়াও, তোমাদেরই আমরা ওয়ার্কার হতে শেখাব।

শিক্ষার অধিকার সব মানুষের আছে, কাউকেই তার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কিন্তু শিক্ষণীয় বিদ্যারও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি চাই। দর্শন বা বিজ্ঞান, সাহিত্য বা অর্থনীতি কখনো স্থিতিশীল হতে পারে না। খবর যেমন প্রতিদিন টাটকা বিদ্যাও তেমনি প্রতিদিন তাজা। যেটা দশ বছর আগে চলতি ছিল সেটা আজ আর চলতি নয়। এক ধর্মশাস্ত্র বা ক্লাসিক্স বা গণিতের কয়েকটি মূলসূত্র ব্যতীত আর সমস্তই তো যুগে যুগে বদলায়। বিশ্ববিদ্যালয় এই পরিবর্তনকে মেনে নেয়, নইলে সেকেলে হয়ে যায়। একরাশ সেকেলে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কোনো দেশ শিক্ষিত হতে পারে না। শিক্ষিত বলতে যদি বোঝায় অচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত তা হলে টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষিতরা কী দোষ করলেন? আমরা তা হলে সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাই না কেন?

শিক্ষা হবে যুগোচিত। সে চলবে যুগের সঙ্গে তাল রেখে। বেতালা হলেই তাকে বাতিল করতে হবে, তা সে সংস্কৃত-ভিত্তিকই হোক আর মাতৃভাষাভিত্তিকই হোক। ইংরেজীকে কেউ চিরন্তন মনে করে না, কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে হাতের কাছে ও ছাড়া আর কোনো ভাষাকে পাচ্ছে না বলেই ইংরেজীকে আঁকড়ে ধরছে। ইংরেজীর ভিতর দিয়ে নিজের যুগকে পাওয়া যায়। ইংরেজীর মতো বাংলা যেদিন এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তার ভাণ্ডার হবে সেদিন বাংলাই হবে উচ্চতম

শিক্ষার বাহন। ইংরেজীর থেকে তর্জমা করে বা তার অনুসরণে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করলে মননের প্রমাণ পাওয়া যাবে না। মনীষার পরিচয় দেওয়া হবে না। বিদ্যার্থীদের দীপগুলিকে জ্বালিয়ে দিতে হলে নিজেদের দীপগুলিকেও জ্বালিয়ে রাখতে হবে। অধ্যাপকদেরই অধ্যয়ন করতে হবে তার আগে। এদেশে ইংরেজী ভিন্ন আর কোন্ বাহন আছে যাতে অধিকতর ও অভিনব অধ্যয়ন সম্ভব ?

তার চেয়ে বড়ো কথা আধুনিক মানবিকতার উত্তরাধিকার থেকে ভ্রষ্ট না হওয়া। প্রাচীন স্বাদেশিক উত্তরাধিকারই মানুষের একমাত্র উত্তরাধিকার নয়। আমরা মানুষ, মানুষমাত্রেরই উত্তরাধিকারী। বিশ্বের যেখানে যা কিছু জানা গেছে, ভাবা গেছে, আবিষ্কার করা হয়েছে, উদ্ভাবন করা হয়েছে সব কিছুই আমাদের। সেইজন্যে আমাদের উচ্চতম বিদ্যাপীঠগুলিকেও হতে হবে সর্বমানবিক। বিশ্ববিদ্যালয় একটা আন্তর্জাতিক তীর্থ। আন্তর্জাতিক মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে মরা গাঙে পরিণত হবে। আন্তর্জাতিক মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যুগের সঙ্গেও তাল রাখা যাবে না। আমরা পেছিয়ে পড়ব। আমাদের ইতিহাসে পেছিয়ে পড়ার নজির আছে। নালন্দা বিক্রমশীলার যুগ অবধি ভারত এগিয়ে রয়েছিল। নানা দেশের বিদ্যার্থীরা আসত ভারতে। পরে দেখা গেল আর কেউ শিখতে আসে না। শেখাতে আসে। প্রথমে আরবী ফারসী। তারপরে ইংরেজী।

আমাদের অধ্যাত্ম বিদ্যার ক্ষেত্রে কোনোদিন ক্রমভঙ্গ ঘটেনি। কিন্তু জাগতিক বিদ্যার ক্ষেত্রে ঘটে প্রায় হাজার বছর আগে। নতুন করে জানা, নতুন করে ভাবা, নতুন কিছু আবিষ্কার বা উদ্‌ভাবন করা ধীরে ধীরে থেমে যায়। জগতের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হলে দেশের বাইরে গিয়ে শিক্ষা নিতে হতো। জাত হারানোর ভয়ে সে সময় আমরা দেশ দেশান্তরে যাইনি, সমুদ্রযাত্রা করিনি। ফলে আমাদের উচ্চতম শিক্ষায় ক্রমভঙ্গ ঘটে। মাদ্রাসা দিয়েও তার পুনরুদ্ধার হয়নি। হয়েছে পাশ্চাত্য আদর্শের কলেজ দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে। সতর্ক থাকতে হবে আবার যাতে ক্রমভঙ্গ না ঘটে। আমাদের বিদ্যার্থীরা যদি বাইরে না যেতে পায়, বাইরের বিদ্বানরা যদি এদেশে আসতে না পান তবে আরো একবার ক্রমভঙ্গ ঘটবে। কায়িক অর্থে কলেজও থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়ও থাকবে, কিন্তু তাদের অবস্থা হবে টোল চতুষ্পাঠীর মতো। অতীতকে নিয়েই তাদের গর্ব, বর্তমানকে নিয়ে নয়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো আধুনিক, আরো আন্তর্জাতিক, আরো মানবিক করতে হবে। যারা স্বাদেশিকতার অনুরাগী তাঁরা টোল চতুষ্পাঠীর পুনরুজ্জীবন বিবেচনা করে দেখতে পারেন। আর যাঁরা বুর্জোয়ার ছোঁওয়া এড়াতে চান তাঁরা আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দেখতে পারেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ডালপালা ছাঁটতে চাইলে আমার

আপত্তি নেই, কিন্তু মূলোচ্ছেদ করতে গেলে আমার আপত্তি আছে। কারণ এটা বিদেশ থেকে আনীত হলেও বিষবৃক্ষ নয়। মধ্যবিত্তরা এর ফল পেড়ে খাচ্ছে বলে সে ফল আঙুরের মতো টক নয়।

সমালোচক যারা তারাও মধ্যবিত্ত। বৈনাশিক যারা তারাও মধ্যবিত্ত সন্তান। মুখে এরা যাই বলুক এদের মনের কথা হলো আঙুর পেড়ে খাওয়া। সে আঙুর সকলের ভাগে জুটছে না। তাই সে ফল টক। বিদ্যা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তা কখনো টক হতে পারে না। তবে সে বিদ্যা যদি সংসারের কাজে না লাগে তবে তার উপরে বিদ্বেষ জাগবে, এটা স্বাভাবিক। তা বলে তাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করাও মূর্খতা। করলে দেশ অন্ধতায় ছেয়ে যাবে। দারিদ্র্য দূর করতে গিয়ে অজ্ঞতার আবাহন করা দূরদর্শিতা নয়। এই ব্যবস্থাই সংশোধিত হলে শ্রমিক কৃষকের গ্রহণযোগ্য হবে।

বাঘ ভালুকের মতো মানুষও ছিল অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী অনিকেত ও নিরাবরণ একটি প্রাণী। ক্রমে ক্রমে সে হয়ে উঠল কৃষিজীবী পল্লীবাসী গৃহস্থ। চাষের সঙ্গে বাস, বাসের সঙ্গে বেশ, আগুন জ্বালিয়ে রন্ধন, ধাতু আবিষ্কার করে অস্ত্রনির্মাণ, চক্র উদ্ভাবন করে রথনির্মাণ, গাড়িতে ও নৌকায় করে আমদানী রফতানী, হরেক রকম কারুশিল্প উৎপাদন, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন, নগর পত্তন, হাট বাজার, ক্রয় বিক্রয়, মুদ্রার ব্যবহার, অর্থের বিনিয়োগ। এই যে প্রোসেস একেই বলা হয় সভ্যতা।

সভ্যতার স্তরে সব দেশের মানুষ একসঙ্গে বা একদিনে পৌঁছয়নি। যতদূর জানা যায় প্রথমে পৌঁছয় সুমেরিয়ার লোক। তারপরে মিসরের। তারপরে সিন্ধু উপত্যকার। তারপরে চীনের। চার হাজার বছর আগেই চারটি সভ্যতার সাধারণ বিকাশ হয়। পৃথক পৃথক বিকাশ আরো আগে। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখে আমরা বিচার করি সভ্যতা বলতে কী বোঝায়। এক দেশের অনুকরণে অপর দেশ সভ্য হয়ে ওঠে। আজকাল প্রায় সব দেশই সভ্য দেশ বলে দাবী করে। এমন দেশ নেই যেখানে মোটরকার নেই, যেখানে বিমান চলাচল নেই, যেখানে রেডিও নেই। যারা লিখতে পড়তে জানে না বা

লেখাপড়ায় কাঁচা তারাও পেট্রোল উৎপাদন ও বিক্রয় করে বড়লোক হয়ে গেছে ও বড়লোকের জীবন যাপন করছে। যাদের দেশেও শহর গড়ে উঠেছে, আকাশচুম্বী অট্টালিকায় শহর ছেয়ে যাচ্ছে। সভ্যতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিকশিত হয়েছে সংস্কৃতি। বোবা প্রাণী শিখেছে কথা বলতে, গান গাইতে, ছবি আঁকতে, নাচতে, অভিনয় করতে, মূর্তি গড়তে, লিপি উদ্ভাবন করে পড়তে ও লিখতে। মনন ও কল্পনা, রসবোধ ও রূপবোধ, ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবিচার, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ললিত কলা দেশে দেশে যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে। সভ্যতার মতো সংস্কৃতিও ব্যাপ্ত হতে পারে, তবে সভ্য হওয়া যত সহজ সংস্কৃতিমান হওয়া তত সহজ নয়। সংস্কৃতির চেয়ে সভ্যতা আরো সুলভ। মূল্যবান ধাতুর আবিষ্কার কঙ্গোদেশকে বঙ্গদেশের চেয়ে সভ্য করতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতিমান করতে পারবে না। তার জন্যে চাই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, বহুকালের ও বহুজনের সাধনা, স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ ও রূপবোধ, সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে ত্যাগস্বীকার, ধনের চেয়ে জ্ঞানের অধিকতর মূল্য, ক্ষমতার চেয়ে করুণার অধিকতর মূল্য, সর্বপ্রাণীর প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা। সভ্য মানুষ অমানুষও হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতিমান মানুষ অমানুষ হয় না, হলে তার সংস্কৃতির অধঃপতন ঘটে। তবে সভ্যতারও একটা মাপকাটি স্থির হয়ে গেছে। সভ্য মানুষ আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলে, জঙ্গলের আইনে ফিরে যায় না। সেটা বর্বরতা।

সভ্যতা দিন দিন এমন আকার নিচ্ছে যে বিজ্ঞান ও টেকনোলজি বিনা গতি নেই, তাই শিক্ষার ঝোঁকটাও তারই উপরে। এক্ষেত্রে কঙ্গোদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশের কোনো ভেদ নেই, যদি থাকে তবে দু'দিন বাদে থাকবে না। কঙ্গোদেশ বিজ্ঞান ও টেকনোলজির পেছনে অনেকবেশী খরচ করছে, ছাত্রদের তালিম করার জন্যে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনাচ্ছে, আরো পাকা তালিমের জন্যে বিদেশে পাঠাচ্ছে। জাপান যেমন করে পাঁচশো বছরের পথ একশো বছরে অতিক্রম করল কঙ্গোও তেমনি করে পঞ্চাশ বছরে অতিক্রম করতে পারে।

এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে হরিজনেরও কোনো ভেদ নেই। কিংবা নেই উচ্চতর শ্রেণীর সঙ্গে তথাকথিত নিম্নতর শ্রেণীরও। পেছনে যদি রাষ্ট্র থাকে, সে রাষ্ট্র যদি পশ্চাৎপদদের অধিকতর মাত্রায় সুযোগ দেয় তা হলে তারা কত দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত সোভিয়েট রাশিয়ার একদা পশ্চাৎপদ জনগণ। এর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের চেয়ে আগের মতো পেছিয়ে নেই। বিজ্ঞানে ও টেকনোলজিতে তাদের অগ্রগতি আরো দ্রুত হবে বলেই মনে হয়।

কিন্তু শিক্ষা বলতে কি কেবল বিজ্ঞান ও টেকনোলজি শিক্ষা বোঝায়? আর্টস বা কলা, হিউমানিটিজ বা মানবিক বিদ্যা এ

না থাকলে ন্যায় অন্যায় ভালো মন্দ সুন্দর অসুন্দর সত্য অসত্যের বিচার বিবেচনা থাকবে না। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করা, স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা, স্বাধীনভাবে কাজ করা এসবও কি থাকবে? অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ এই দিকটার উপরেই ঝোঁক দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শিক্ষানায়করাও ইউরোপের অনুসরণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে ইউরোপের নানা দেশে ও আমেরিকায় শিল্পবিপ্লব তথা টেকনোলজিকাল রেভলিউশন ঘটে যাওয়ায় জাপানের তথা ভারতের ঝোঁকটাও বদলে গেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা যে নতুন যুগের সূচনা হলো তার প্রভাব হবে শিক্ষার উপরেও সুদূরপ্রসারী। পারমাণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টায় প্রয়োগ করতে গেলে হাজার হাজার কর্মীর প্রয়োজন হবে। তাদের শিক্ষার ধারাটাই হবে ভিন্ন। তাদের প্রয়োজন বেশী বলে মজুরিও বেশী হবে, মজুরি বেশী বলে মর্যাদাও বেশী হবে। মানবিক বিদ্যার ছাত্ররা এমনিতেই কাজ জোটাতে পারছে না। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে নাকি দর্শনের ছাত্র হয় না, তাই বিভাগটাই উঠে গেছে। বিশ্বভারতীও এখন দোটানায় পড়েছে। বিজ্ঞান রাখবে কি রাখবে না। রাখলে ওইদিকেই ঝোঁক পড়বে। না রাখলে ছাত্র হবে না। ছাত্ররা পাশ করে খাবে কী?

পাশ করে খাবে কী এখন ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদের সকলেরই ভাবনা। যারা গণিতে কাঁচা, বিজ্ঞানের বা প্রযুক্তি বিদ্যার স্রোত তাদের টানে না। তাদের কতক যায় বাণিজ্যের স্রোতে ভেসে। আর কতক ভেসে বেড়ায় মানবিক বিদ্যার স্রোতে। অর্থনীতিও আজকাল গণিত-নির্ভর হয়ে উঠেছে। গণিতে দক্ষ না হলে অর্থনীতিতেও দক্ষতা অর্জন করা শক্ত। যেদিক থেকেই দেখি না কেন গণিতই একালের পরাবিদ্যা। যুদ্ধক্ষেত্রেও এর মূল্য অসীম। বাণ ছুঁড়তে হলে অঙ্ক কষে ছুঁড়তে হয় যাতে শত্রুর সুরক্ষিত অবস্থানের উপর পড়ে। যুদ্ধটা এখন মস্তিষ্কের যুদ্ধ। ষণ্ডা গুণ্ডা না হলেও চলে, যদি অঙ্কে মাথা খেলে। বেহিসাবী অস্ত্রবর্ষণ একালে জয় এনে দেয় না। তাই যুদ্ধবিদ্যাও এখন গণিতনির্ভর। তবে চিরকাল যেমন এখনো তেমনি সাহসের মূল্যই সর্বাধিক।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শে গঠিত স্কুল কলেজ-গুলোকে বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের আদর্শে পুনর্গঠন করতে হবে। একাজ অন্যান্য দেশে আরম্ভ হয়ে গেছে। "ভারত কেবলি ঘুমায়ে রয়।" সব ছাত্রের জন্যে একই ব্যবস্থা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্রকেই তিনটি বিষয় গোড়া থেকে ভালো করে শেখানো দরকার। একটি তো গণিত। আর একটি মাতৃভাষা। আর একটি ইংরেজী। কিন্তু কোনোটিকেই আবশ্যিক করা উচিত নয়। ধর্মে যেমন কম্পালসন

নেই শিক্ষাতেও তেমনি কম্‌পালসন থাকবে না। তুমি শিখতে চাও না? বেশ তো, তুমি শিখবে না। বাড়ী গিয়ে খেলা কর। আর যদি স্কুলে পড়ার ইচ্ছা থাকে তবে এই এই বিষয় তোমাকে শেখাতে পারি। কোন্ কোন্ বিষয় শিখতে চাও তা তুমিই বল। কিছুদিন একটা বিষয় শিখে সেটা যদি ছেড়ে দিতে চাও তাতেও আমরা বাধা দেব না। যেটুকু শিখলে সেইটুকুই লাভ। তবে পরীক্ষা পাশ করার ইচ্ছা থাকলে তোমাকে তিন চার রকম কোর্সের থেকে একটা বেছে নিতে হবে। বেছে নিলে লেগে থাকতে হবে। তৈরি না থাকলে পরীক্ষা দিয়ো না। পরে আবার সুযোগ পাবে। কিন্তু আর পাঁচজনকে বাধা দিয়ো না। তোমার স্বাধীনতাকে আমরা মূল্য দিয়েছি। অন্যের স্বাধীনতাকেও তুমি মূল্য দাও। পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়েই হবে। যারা তৈরি থাকবে তারা পরীক্ষা দেবে। টোকাটুকি করলে বুঝতে হবে তারা সত্যি তৈরি নয়। তা হলে আরো ক'মাস সময় নিক। আবার পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাবে। প্রত্যেককে তিনবার সুযোগ দেওয়া হবে। একটি বিষয়ে পাশ করলে দ্বিতীয়বার সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না। বাকী বিষয়-গুলোর উপর জোর দিতে পারা যাবে।

বলা বাহুল্য তিনটি মূল বিষয়ের নাম করেছি বলে সেই ক'টি বিষয়ই পুরো কোর্স নয়। কোর্স সংখ্যা দশটাও হতে পারে, বিশটাও হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে যে কোনো

পাঁচটা বিষয় নিয়ে এক একটা কোর্স। বিষয় তালিকায় থাকবে ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, নাচ গান বাজনা, সুতো কাটা, তাঁত বোনা, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, চাষের কাজ, গোপালন, রন্ধন, প্রসাধন, গৃহস্থালীর কাজ ইত্যাদি। তা ছাড়া সাধারণত যা পড়ানো হয়। তেমনি মাধ্যমিক পর্যায়েও পাঁচটি বিষয় নিয়ে একটি কোর্স। বিষয় তালিকাও তেমনি বিচিত্র। কলেজে পাঁচটির থেকে তিনটি হবে। শিক্ষা আরো নিবিড় হবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একটি। শিক্ষা নিবিড়তম।

কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক যদি প্রতিজ্ঞা করে থাকে যে সবাই হবে নগরবাসী আর সমাজশুদ্ধ মানুষ যদি ব্রত নিয়ে থাকে যে সকলেই হবে ভদ্রলোক তা হলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি আপনার ভারে আপনি ভেঙে পড়বে। গ্রামকে মেরে শহর নয়, চাষকে ও কারিগরিকে মেরে যন্ত্রশিল্প নয়, চাষী ও কারিগরকে মেরে ভদ্রলোক নয়। আগে গ্রাম, তারপরে শহর। আগে চাষ ও কারিগরি, তার পরে যন্ত্রশিল্প, আগে চাষী ও কারিগর, তারপরে ভদ্রলোক। এই অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। এর পরিণাম হবে ঘোরতর সঙ্কট। সঙ্কট মোচনের জন্যে চীনের মতো শহরকে শহর খালি করে দিতে হবে। স্কুলকে স্কুল, কলেজকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণ সর্বাঙ্গীন হলে তারপরে স্থির করা যাবে কত ধানে কত চাল। ক'টা গ্রামে ক'টা শহর। ক'জন

কারিগরে ক'জন যন্ত্রশিল্পী। ক'জন চাষীতে ক'জন ভদ্রলোক। শিক্ষাব্যবস্থাও সেই অনুসারে ঢেলে সাজতে হবে।

নির্বিচারে পরিবারবৃদ্ধির মতো নির্বিচারে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বৃদ্ধি শিক্ষাকে দিকে দিকে প্রসারিত করছে, কিন্তু তার উৎকর্ষ দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। আজকালকার একটা টাকা যেমন আসলে পাঁচ আনা তেমনি একজন গ্রাজুয়েটও আসলে একটি ম্যাট্রিকুলেট। এর নাম অবমূল্যায়ন। এ পথে চললে আরো অবমূল্যায়ন হবে। যাঁরা কৃষির গ্রাজুয়েট তাঁরা মাঠে নামবেন না, হাত লাগাবেন না, চাষীদের উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত। যাঁরা টেকনোক্রাট তাঁদেরও একই মানসিকতা। মানুষকে হাত দেওয়া হয়েছে শুধু আফিসে কলম ধরার জন্যে আর বাড়ীতে ছুরি কাঁটা ধরার জন্যে। যাঁরা সাহেব নন, বাবু, তাঁদের বাবুয়ানাও কায়িক শ্রমের থেকে শত হস্ত দূরে। শেষে এমন হয়েছে যে আফিসের বেয়ারা বা চাপরাশিও ফাইল বহন করবে না, জল গড়িয়ে দেবে না। কারণ তারাও স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করেছে। কেউ কেউ কলেজেও গেছে। কেন তা হলে তারা বাবুদের সঙ্গে সমান হবে না ?

সাম্যই যদি কাম্য হয় তবে সাহেবদেরই বাবুদের সঙ্গে সমান হতে হবে, বাবুদেরও চাপরাশি বেয়ারাদের সঙ্গে সমান হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ারদেরও মিস্ত্রীদের সঙ্গে সমান হতে হবে, জোতদারদেরও হাল লাঙল ধরতে হবে। শিক্ষাও হবে তার

অনুরূপ। বিদ্যার উপর ততটা নয়, কর্মিষ্ঠতার উপর যতটা জোর দিতে হবে।

সাম্যের প্রশ্ন আজকের ছুনিয়ার সব চেয়ে বিতর্কিত প্রশ্ন। এক এক দেশ এক এক ভাবে এর উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। কোন কোন দেশে ঘোরতর সামাজিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। যাকে বলে বিপ্লব। কিন্তু এখনো স্থিতি আসেনি। চীনের সর্বময় কর্তা একবার মাত্র বিপ্লবে সন্তুষ্ট নন। তাঁর মতে বিপ্লব বার বার ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়বারের বিপ্লবের নাম দেওয়া হয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ওটা জমিদার বা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নয়, উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ উচ্চবংশীয়দের বিরুদ্ধে। যদিও তাঁরা সবাই কর্তাভজা মার্কসবাদী। এখন শোনা যাচ্ছে শূন্যতা পূরণের জন্যে তাঁরাই এক এক করে ফিরে আসছেন, কর্তার সেটা অসহ্য। তাই তৃতীয়বারের পূর্বলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরশুরাম সমাজকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। এঁরা ক'বার নির্মান্দারিন করবেন কে জানে! মান্দারিনরাই চীনদেশের ব্রাহ্মণ।

কিন্তু সাম্যের প্রশ্নই একমাত্র বিতর্কিত প্রশ্ন নয়। রুশো যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সে প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি। শিশু কি প্রকৃতির শিশু নয়? প্রকৃতির পাঠশালায় না পড়ে মানুষের পাঠশালায় পড়লে তার কি পূর্ণ বিকাশ হবে? মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক যুগের উপযোগী করলে তাদের কী লাভ হবে যারা প্রকৃতির সন্তান? যারা পাহাড়ে জঙ্গলে

থাকে। যারা থাকে দুর্গম পল্লীতে। শহরে স্কুল কলেজের পুঁথিপোড়ো শিক্ষিত মানুষ তাদের কাছে শিক্ষার আলোক নিয়ে যাবে এটা এক হাস্যকর ধৃষ্টতা। শিক্ষার আলোকের জন্যে তাদের শহরে টেনে আনতে চাওয়াটাও কি হাস্যকর স্পর্ধা নয়? চীনের শহুরে শিক্ষিতদের এখন লাখে লাখে গ্রামে পাঠানো হচ্ছে। তাতে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগও বহুপরিমাণে সুগম হবে। সভ্যতা বলতে যদি বোঝায় প্রকৃতির উপর খোদকারী তাহলে এটা তার উজানযাত্রা। সংস্কৃতি বলতে যদি বোঝায় বিকৃতি বা বিনাশ তা হলে এটা তার সংশোধন। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য কেমন করে হবে এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকেও ভাবিয়েছিল। তাঁর উত্তর তপোবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা। শান্তিনিকেতন এখন আর বনস্থলী নয়। শহরতলী। দেশের সর্বত্র বন কেটে বসত হচ্ছে। বসত হয়ে উঠছে শহরতলী। প্রকৃতি হটে যাচ্ছে। প্রকৃতি কি এর প্রতিশোধ নেবে না? এ প্রশ্নও সাম্যের প্রশ্নের মতো বুনিয়াদী প্রশ্ন।

এ ছাড়া আরো এক বুনিয়াদী প্রশ্ন আছে। অ্যাথেন্স না স্পার্টা? কোন্‌টা বরণীয়? এ প্রশ্ন যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের মনে জেগেছে। ইংরেজদের মতো আমরাও হয়েছি স্পার্টার চেয়ে অ্যাথেন্সের অনুরাগী। কিন্তু সেই একমাত্র প্রভাব নয়। স্পার্টাও কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের উত্তরপুরুষ কোন্‌দিকে ঝুঁকবে কে জানে।

আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার ভারতবর্ষ আর্যদের দেশ, আর্যরাই ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী বা প্রকৃত অধিবাসী, তারা আর কোনো দেশ থেকে আসেনি, তারা কোনোদিনই বহিরাগত ছিল না, ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে তাদের সঙ্গেই, তাদের পূর্বে নয়, ভারতের সংস্কৃতির মূল হচ্ছে বেদ, বেদে সব কিছু আছে, বেদজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সর্বজ্ঞ, বেদ যে ভাষায় রচিত সে ভাষা হচ্ছে দেবভাষা, আর সব ভাষা সে ভাষার সন্তান অথবা তার তুলনায় নিকৃষ্ট, সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতি, তাকে হিন্দু সংস্কৃতিও বলা যায়, যে হিন্দু সে ভারতীয়, যে ভারতীয় সে হিন্দু, মুসলিম বা ইউরোপীয় বহিরাগত বলেই অভারতীয় তথা অহিন্দু, তাদের বাদ দিলেও ভারতের সংস্কৃতির সম্পূর্ণতাহানি হয় না, হাজার বছর আগেই ভারতের সংস্কৃতি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, তার পরে যদি সে ক্ষীণ হয়ে থাকে তবে সেটা বিদেশী ও বিধর্মীদের অনধিকার প্রবেশের ফলে, এখন যেটা চাই সেটা হলো তার পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভাল, তাতে মুসলিমের বা পাশ্চাত্যের কোনো ভূমিকা নেই, পশ্চিমের মতো একটা রেনেসাঁস হয়েছে বা হওয়া উচিত যারা বলে তারা ভ্রান্ত, ভারত

কারো ধার ধারে না ও ধারবে না, ভারতীয় সংস্কৃতি পুরাতন তথা সনাতন, সুতরাং নূতন হবে কী করে ?

উপরে যে সংস্কারের কথা বলা হলো তার বিরুদ্ধে গত দুশো বছরে অসংখ্য প্রমাণ জমেছে। ভারতবর্ষ প্রধানত অনার্যদের দেশ, অনার্যরাই তার আদি অধিবাসী. তাদের কেউ বা অস্ট্রীক, কেউ বা মঙ্গোল, কেউ বা দ্রাবিড়, আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে, আর্যরা যেমন ভারতে এসেছে তেমনি ইরানে গেছে, ইউরোপে গেছে, আর্য সভ্যতা ভারত থেকে আয়ারল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, এখন তো আমেরিকা পর্যন্ত, আর্যরা যেখানেই গেছে সেখানেই আর্যপূর্ব সভ্যতার সঙ্গে বিরোধ বেধেছে, পরে সন্ধি হয়েছে, সন্ধির ফলে আর্যরা হয়েছে অনার্যীকৃত ও অনার্যরা আর্যীকৃত, মিশ্র সভ্যতার উদ্‌ভব ঘটেছে, সংস্কৃতিও হয়েছে দেশোচিত ও কালোচিত, যুগে যুগে তার পরিবর্তন ঘটেছে, আর্যেতর ভূভাগ থেকে খ্রীস্টধর্ম ও সংস্কৃতি এসে ইউরোপের গ্রীক রোমক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে, হাজার বছর পরে রেনেসাঁসের কল্যাণে সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে, লোকে আর বিশ্বাস করছে না যে বাইবেলে সব কিছু আছে বা যাঁরা বাইবেলজ্ঞ তাঁরা সর্বজ্ঞ, জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের বন্ধ দুয়ার খুলে যাওয়ায় মধ্যযুগের অন্ধকার ঘুচে গেছে ও আধুনিক যুগের আলোয় দশদিক উজ্জ্বল হয়েছে, লাটিন হটে গেছে, ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি এগিয়ে গেছে।

ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখার সময় এসেছে। এদেশ আর্যদের অধিকারে আসার আগে যাদের অধিকারে ছিল তারাও বহু পরিমাণে সভ্য ছিল। তারা যে কী পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার প্রমাণ মোহেনজোদরো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা। খননকার্য এখনো সমাপ্ত হয়নি, হলে দেখা যাবে যে সিন্ধু উপত্যকার সেই দুটি নগরের মতো আরো কত নগর অন্যান্য নদীকূলে বা সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। আর্যদের আগমনের কাল খ্রীস্টপূর্ব বিংশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী বলেই অনুমান করা হয়। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তার আগেই পূর্ণতা লাভ করেছিল। ওরকম একটি সভ্যতা হাজার বছরের কমে পূর্ণতা লাভ করে না। কৃষি থেকে শুরু করতে হয়। তার সঙ্গে যোগ দেয় কারুশিল্প। বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। তার উপযোগী যানবাহন আবশ্যক হয়। নদীপথে নৌকা। স্থলপথে গাড়ি বলদ হাতি ঘোড়া উট। পণ্য বিনিময় থেকে ভাব বিনিময় আসে। লিপির উৎপত্তি, মুদ্রার উৎপত্তি ঘটে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও বিবর্তিত হয়। রন্ধন, বেশভূষা, মাটির পাত্র, ধাতু নির্মিত অস্ত্র থেকে লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির থেকে উচ্চতর সংস্কৃতি, কবিতা সঙ্গীত নৃত্য নাট্য চিত্রকলা ভাস্কর্য স্থাপত্য দর্শন ধর্মশাস্ত্র।

আমার অনুমান আর্যদের আগমনের পূর্বেই ভারতের নদী ও সমুদ্রকূলে ছোট বড়ো শহর গঞ্জ বন্দর গড়ে উঠেছিল, গ্রাম গড়ে উঠেছিল আরো আগে। লোকসংস্কৃতি তো বিবর্তিত

হয়েছিলই, সঙ্গীত নৃত্য নাট্য কবিতা প্রভৃতি উচ্চতর সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটেছিল। আর্যরাই এসে এসব প্রবর্তন করে এমন নয়। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্যদের আগমনের পূর্বেই বহুদূর প্রগতি করেছিল। আমার তো মনে হয় বাংলা-দেশের আর্যপূর্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিও বঙ্গোপসাগরের অপর পারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। পাণ্ডববর্জিত দেশ বলে এ দেশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিবর্জিত ছিল না। আর্যরা কবে আসবে না আসবে তার জন্যে দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতি অপেক্ষা করে বসে থাকেনি। নিজেই উদ্যোগী হয়ে সিংহলে গেছে, যবদ্বীপে গেছে। আর্য দেবদেবীর চেয়ে লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যা ও প্রভাব এ দেশে তখনো বেশি ছিল, এখনো বেশি। বেদের চেয়ে তন্ত্রের প্রভাব বেশি এদেশে। ব্রাহ্মণপ্রাধান্য দেড় হাজার বছরের আগে ছিল না। তার পূর্বে বৌদ্ধপ্রাধান্য জৈনপ্রাধান্য ছিল। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় বাংলাদেশ একটা প্রদেশে পরিণত হয়নি। ভারতকেও দেশ বলা হতো না। 'বর্ষ' প্রায় মহাদেশের মতো।

আর্যপূর্ব সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক আর্য সংস্কৃতির বহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যে যুক্তবেণী রচনা করে রামায়ণ মহাভারত তারই সৃষ্টি। ততদিনে আর্য ও অনার্য বহুল পরিমাণে বিমিশ্র হয়েছে। তাকে আর অমিশ্র করবার উপায় নেই। তবু বর্ণশুদ্ধির জন্যে ও বর্ণসাঙ্কর্যের ভয়ে যত রকম

কঠোর বিধান জারী করা হয়। আর্যপূর্ব যুগেও কতক লোক পৌরোহিত্য করত। কতক লোক করত রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ। কতক লোক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। এরাও আর্যদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়। গোড়ার দিকে এই তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহ চলত। এই তিন বর্ণ অর্থাৎ দ্বিজাতি এক দিকে ও চতুর্থ বর্ণ শূদ্র অন্যদিকে। শূদ্ররা সাধারণত আর্যপূর্ব সমাজেরই বৃহত্তর অংশ। চাষী আর কারিগর আর মজুর শ্রেণীর লোক, যাদের না হলে জগন্নাথের রথ চলে না। অথচ চালক তারা নয়। তারা চালিত। আমেরিকার দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের মতো ভারতের দরিদ্র আর্যরাও তাদের সঙ্গে ছিল। উচ্চতর সংস্কৃতিতে তাদের ভাগ সামান্য হলেও লোকসংস্কৃতিতে অসামান্য।

ভারতের আর্যোত্তর সংস্কৃতির উচ্চতর স্তর মোটের উপর আর্য ও আর্যপূর্ব পুরোহিত ও সৈনিক বণিকদের নেতৃত্বে চালিত ও বিকশিত "এলিৎ" সংস্কৃতি। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে সে সংস্কৃতি সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়। আর বৌদ্ধ জৈন ধর্মের শিক্ষায় সে সংস্কৃতি দীন হীন পতিত পাতিত শূদ্র ও অন্ত্যজকেও দুই হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নেয়। বৈদিক দেবতাদের উপাসকদের মধ্যেও ক্রমে ভক্তিবাদের প্রাবল্য হয়। তখন ভক্তির তরঙ্গ উঠে জাতিবর্ণের বেড়া ভেঙে দেয়। তবে সমভূম করে না সমাজকে। পরবর্তীকালে যাকে হিন্দু বলে অভিহিত করা হয়

তার যেটি উদারতর ধারা সেটি বৌদ্ধ সাধনার মতো ভারতের বাইরেও প্রসারিত হয়। তার গতিবেগ চীন জাপান মালয় ইন্দোনেশিয়া তিব্বত মধ্য-এশিয়া বর্মা ইন্দোচীনেও অনুভূত হয়। কিন্তু প্রসারণের পরে আসে সঙ্কোচনের যুগ। সব সভ্যতার ইতিহাসে এটা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্যপ্রভাবিত দ্বিজাতি পরিচালিত বৈদিক বৌদ্ধ উদারনৈতিক সংস্কৃতিভিত্তিক সংস্কৃতি একদা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসে, থেমে আসে, আপনাকে গুটিয়ে আনে। চূড়ান্ত পর্যায়ের কাল আমাদের ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ। গুপ্তবংশীয় রাজাদের যুগ। এই যুগে সাগরপারের ভারতীয় সভ্যতা তার সুদূরতম সীমায় পৌঁছায়। হিমালয় পারের ভারতীয় সভ্যতাও।

এর পরের অধ্যায় কূপমণ্ডূকতা। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হিমালয় অতিক্রম করাও তাই। হিন্দুসমাজের নিয়ম কানুন দিন দিন আরো কড়া হয়। কেউ তো বিদেশে যাবেই না বিদেশ থেকে কেউ এলে তাকেও সমাজে নেওয়া হবে না। যেমন গ্রীকদের শকদের কুশানদের হূনদের নেওয়া হয়েছিল। এই কূপ-মণ্ডূক অবস্থায় ভারতের দুর্বলতা ইসলামকে সহজে পথ ছেড়ে দেয়। সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতির ঘরে নূতনত্বের অভাবও ছিল, সেটা ভরাবার জন্যে আরব্য তথা পারসিকভিত্তিক সংস্কৃতির প্রয়োজনও ছিল। আরো পরে ইংরেজীভিত্তিক সংস্কৃতির।

ভারতের মধ্যযুগ সুরু হয় ইউরোপের মধ্যযুগেরই প্রায়

সমসাময়িককালে। শেষ হয়ও তেমনি সমসাময়িককালে। প্রায় 'সমসাময়িক' বলেছি এই জন্যে যে ভারতের মধ্যযুগ শ-দুই বছর বিলম্বে আসে, শ-দুই বছর বিলম্বে যায়। আমাদের মধ্যযুগের প্রথম আধখানা জুড়েছিলেন রাজপুত রাজন্যরা, আর দ্বিতীয় আধখানা তুর্ক ও মুঘল সুলতান ও বাদশাহরা। ভারতের মুসলিম শাসন গোটা মধ্যযুগটা অধিকার করেনি। ইংরেজ অধিকার তো তারও তিনভাগের একভাগ। তবে যত কম সময়ই থাকুক না কেন ইংরেজরাই এসেছিল আধুনিক যুগের বার্তা নিয়ে। ওরাই প্রবর্তন করে ভারতের আধুনিক যুগ।

মধ্যযুগীয় হিন্দু তথা মুসলিম শক্তিতে নিশ্চয়ই তফাৎ ছিল, কিন্তু উভয়েই মধ্যযুগীয়। অপর পক্ষে ওদের সঙ্গে ইংরেজদের তফাৎ শুধু যে ধর্মে ধর্মে বা ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে তফাৎ তাই নয়, যুগে যুগে তফাৎ। সে তফাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুগত অজ্ঞানের। ইংরেজরা যে সময় এই উপমহাদ্বীপে আসে তার আগেই তাদের মহাদেশের পশ্চিমাংশে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেণ্ট ঘটে যায়। এই দুটি আলোকবর্তিকা থাকে তাদের হাতে। তাদের মশাল থেকে আমরাও আমাদের মশাল জ্বালিয়ে নিই। তখন আমাদের এখানেও ঘটে রেনেসাঁস তথা এনলাইটেনমেণ্ট। তবে তেমন উজ্জ্বলভাবে নয়। তার কারণ কি আমাদের পরাধীনতা, না আমাদের অতীতমুখীনতা? পুরাতনকেই আমরা সনাতন বলে ভাবি, নতুনকে ক্ষণিকের বলে উড়িয়ে দিই। এটা কী হিন্দু কী

মুসলমান উভয়েরই মজ্জাগত। ইউরোপেও ছোঁওয়া না লাগলে, দোলা না লাগলে, ধাক্কা না লাগলে আমরা যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই থাকতুম। আমাদের প্রতিবেশী চীন জাপানের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তেমনি ইরান তুর্ক আরব প্রতিবেশীদের সম্বন্ধেও। সাম্রাজ্যবাদী হয়ে যারা আমাদের আঘাত করেছে তারাই প্রগতিবাদী হয়ে আমাদের জাগিয়েছে।

তুর্ক মুঘল প্রভৃতি ইসলামপন্থীদের আগমনের পূর্বেই আমাদের সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতি বস্তুজ্ঞান হারিয়েছিল। বস্তুজ্ঞান না থাকলে কি ব্রহ্মজ্ঞান থাকে? ব্রহ্মজ্ঞান থাকলে আরো কয়েকখানি গীতা উপনিষদ্ লেখা হতো, রাশি রাশি টীকাভাষ্য নয়। আরো কয়েকটি দর্শনের উৎপত্তি হতো, রাশি রাশি ভক্তিগ্রন্থের বা পুরাণের নয়। ভক্তিও মহামূল্য নিধি, ভক্তিকে খাটো করা উচিত নয়, তবু একথাও মানতে হবে যে জ্ঞানবিজ্ঞান তথা মৌলিক সৃষ্টির দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে পায়চারি করতে থাকে। এমন সময় হাজির হয় পারসিক বা ফারসীভিত্তিক সংস্কৃতি, তার সঙ্গে আরব্য সংস্কৃতি। আরব্য সংস্কৃতি যে কোরান-সর্বস্ব ছিল তা নয়। তার অঙ্গে অঙ্গীভূত গ্রীক দর্শন, চিকিৎসা-বিদ্যা, জ্যোতিষ। আরবী ফারসী শিক্ষার দ্বার হিন্দুদের কাছেও মুক্ত ছিল। যারা টোল চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ পেতো না তারা মক্তবে মাদ্রাসায় প্রবেশ পেতো। শূদ্ররা সংস্কৃত থেকে বঞ্চিত ছিল।

আরবী ফারসী থেকে বঞ্চিত হলো না। রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানের হাতে সেখানে সংস্কৃত তেমন অর্থকরী নয়, ফারসী যেমন। কায়স্থ প্রভৃতি জাতের ছেলেরা এই প্রথম মাথা তোলার সুযোগ পায়। তুর্ক ও মুঘল শাসনে হিন্দুদের ভাগ্যে যেসব পদ জোটে সেসব আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের একচেটে নয়, হিন্দু সমাজের নিম্নতর অংশও তার শরিক হয় ও প্রতিযোগিতায় আরো উচ্চে ওঠে। মুসলিম শাসন একদিক থেকে বৈপ্লবিক। ব্রিটিশ শাসনও।

আরো একদিকে প্রগতিশীল ছিল, তবে শুধু মুসলিম শাসন নয়, অবশিষ্ট হিন্দু শাসনও। সর্বত্র দেখা যায় সংস্কৃত কোণঠাসা হচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে বাংলা হিন্দী মরাঠী তামিল তেলুগু প্রভৃতি অসংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। সংস্কৃত থেকে ভাবানুবাদ হয়ে যায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের, লোকে তাদের জন্যে সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী হয় না। সংস্কৃতি এইভাবে সর্বস্তরে ছড়িয়ে যায়। বেদ কিন্তু গুহায় নিহিত থাকে, কোরানও। তার জন্যে আরো একটা বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজী শিক্ষার। বেদ ও কোরান ইংরেজীতে তর্জমা হয়ে যায়। তার থেকে আসে বাংলা হিন্দী ভাষায় মূলের অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ।

আর্যপূর্বেরা যেমন করে আর্যীকৃত হয়েছিল, আর্যরা যেমন আর্যপূর্বীকৃত হয়েছিল, হিন্দুরাও তেমনি করে মুসলিম প্রভাবিত হয়, মুসলিমরাও তেমনি করে হিন্দু প্রভাবিত, উভয়েই পাশ্চাত্য

প্রভাবিত তথা আধুনিকত্বে উপনীত। এই যে উপনয়ন এটা হাজার কি বারো শ বছর পরে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ। আরবী ফারসী শিক্ষার চেয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিপত্তি ও প্রসার বেড়ে যায়। ইউরোপের সঙ্গে গভীরতর গ্রন্থিবন্ধন হয়। সে গ্রন্থি ব্রিটিশ অপসরণের পরেও ছিন্ন হয় না। এখন তো সংস্কৃত শিক্ষার উপর কোনোরকম বাধানিষেধ নেই, তবু লোকে ইংরেজী শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দেয়। যেখানে অর্থকরী নয় সেখানেও। 'এলিৎ' বলতে একদা সংস্কৃতশিক্ষিত বোঝাত, পরে আরবী ফারসী শিক্ষিত, আরো পরে ইংরেজী শিক্ষিত। এখনো তাই। যেদিন বাংলাশিক্ষিত কি হিন্দীশিক্ষিত বোঝাবে সে দিনের কত দেরি!

উচ্চতর সংস্কৃতি এখনো 'এলিৎ' কিন্তু সেই 'এলিৎ' নয়। সংস্কৃতির যে অংশটা লোকসংস্কৃতি সেটার সঙ্গে উচ্চতর সংস্কৃতির বিভেদ আদিযুগেও ছিল, মধ্যযুগেও ছিল, আধুনিক যুগেও রয়েছে। এ বিভেদ কি শিল্পায়ন তথা নগরায়নের দ্বারা দূর হবে বা হ্রাস পাবে? নতুন কোনো 'এলিৎ' উঠবে, না ওই শ্রেণীটাই লোপ পাবে? ওদের স্থান কি জনগণ নিতে পারবে?

আর্যপূর্ব সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক আর্য সংস্কৃতির বহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যেমন একটি যুক্তবেণী রচনা করেছিল তেমনি আর একটি যুক্তবেণী রচনা করত মুসলিমপূর্ব হিন্দু সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক মুসলিম বা পারসিক

তথা আরব্য সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গম। সেদিকে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আর অগ্রসর হওয়া গেল না। ইউরোপ এসে পড়ল। ইংরেজপূর্ব হিন্দু মুসলিম মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক পাশ্চাত্য তথা অধুনিকযুগীয় সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গমও কিছুদূর অগ্রসর হয়। এমন সময় পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। নইলে আরো একটি যুক্তবেণী রচিত হতে পারত। তিনটি যুক্তবেণীর রচনা সমাপ্ত হলে ভারতীয় সংস্কৃতি হতো তিনজোড়া সংস্কৃতির ত্রিবেণীসঙ্গম। আর্যপূর্ব আর আর্য মিলে প্রাচীন হিন্দু। হিন্দু আর মুসলিম মিলে মধ্যযুগীয় হিন্দুস্থানী। ভারতীয় আর আধুনিক পাশ্চাত্য মিলে আধুনিক ভারতীয়।

যে দুটি বেণীরচনা অসমাপ্ত থেকে গেল সে দুটি কি চির অসমাপ্ত থেকে যাবে? না, আবার চেষ্টা করা যাবে যাতে সমাপ্ত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের আরব্ধ অথচ অসমাপ্ত কাজ আমাদের উপরেই বর্তায়। আমরা না পারলে আমাদের উত্তরপুরুষদের উপর। একদা আমার ধারণা ছিল যে হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তথা ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যে তথা উর্দু সাহিত্যে মূর্ত হয়েছে। তা ছাড়া বেশভূষায় আদবকায়দায় চালচলনে অভিজাত মহলের হিন্দু মুসলমানের একত্ব ঘটেছে। কিন্তু সে ধারণা একেবারে ভুল না হলেও পুরোপুরি ঠিক নয়। ভারতীয় মুসলমানদের একজোড়া

উত্তরাধিকার। একটা তো ভারতীয়, আর একটা মধ্যপ্রাচ্য। তাদের সেই মধ্যপ্রাচ্য উত্তরাধিকারের অল্পই হিন্দুরা পেয়েছে। তেমনি হিন্দুদের উত্তরাধিকারের যেটা প্রাচীনতর অংশ তার ভাগও মুসলমানরা অল্পই পেয়েছে। অল্পের সঙ্গে অল্প মিলে কতটুকু মিলন ঘটাতে পারে! অজ্ঞতার সঙ্গে অজ্ঞতা মিলে তার চেয়ে বহুগুণ অমিল ঘটিয়েছে।

প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোম সম্বন্ধে আমরা সামান্যই জানি। তেমনি খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান পরিমিত। তাদের বাদ দিয়ে আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মিলন কি সম্ভব? অথচ এই ছিল আমাদের ধ্যান। এ ধ্যান ব্যর্থ হয়েছে। প্রাচীনের সঙ্গে প্রাচীনের ও আধুনিকের সঙ্গে আধুনিকের মিলনই সম্ভব ও সঙ্গত। এখন তারই ধ্যান করতে হবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি বরাবরই মেলাবার সাধনা করেছে। কখনো পেরেছে, কখনো পারেনি, কিংবা খানিকটা পেরেছে। তার পরিপূর্ণতার জন্যে বাকিটার প্রয়োজন আছে। তাই তার পক্ষে আত্মসন্তুষ্ট হওয়া সাজে না।

আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতি ছয়টি মহান যুগ অতিক্রম করে এসেছে। প্রথমটি হরপ্পা মোহেনজোদরোর সিন্ধু সভ্যতার বিস্মৃত যুগ। আর্য আগমনের পূর্ববর্তী ভারত ছিল সুমেরিয়া ও মিশরের পর তৃতীয় প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ-

ক্ষেত্র। দ্বিতীয়টি আর্য আগমনের পরবর্তী বেদ উপনিষদ্ বৌদ্ধ জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও দর্শনের সিন্ধু থেকে গঙ্গামুখী ও উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী অভিযানের যুগ। তৃতীয়টি রামায়ণ মহাভারতের পুরাকাহিনীকে শাশ্বত কাব্যে গ্রথিত করার ও বৌদ্ধধর্মকে সুদূর-প্রসারী করার যুগ, যে যুগে ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতি এশিয়ার অধিকাংশ দেশে পরিব্যাপ্ত হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রত্যেকটি যুগের স্থায়িত্ব কমবেশী এক সহস্রাব্দী। চতুর্থটি গুপ্তবংশের পরবর্তী রাজপুত ও পাল যুগ। এ যুগ ছয় শতাব্দীর মধ্যে শেষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতিও নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাইরে থেকে প্রেরণা সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। সে প্রেরণা একদিক না আরেকদিক থেকে আসত। প্রথমে এল মধ্যপ্রাচী থেকে। এশিয়ার সেই ভূখণ্ডও ভারতের মতো বহুকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন। আর্য ও সেমিটিক ধারা মিলে সেখানেও যুক্তবেণী রচনা করেছিল।

মধ্যপ্রাচী থেকে নতুন প্রেরণা পেয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি আবার পুষ্পিত হয় পঞ্চম যুগে উপনীত হয় ভারতের ইতিহাস। এ যুগ আকবর শাহজাহানের যুগ। নানক কবির চৈতন্যের যুগ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি মীরাবাই তুলসীদাসের যুগ। বাংলা হিন্দী মরাঠী গুজরাটী প্রভৃতি সাহিত্যের বিকাশের যুগ, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গৌরবের যুগ। কিন্তু এ যুগও ছয় শতাব্দীর মধ্যেই নতুন প্রেরণার অভাবে প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তখন অভিনবতর

প্রেরণা আসে সাগরপার থেকে। কখনো কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি অর্বাচীন দেশ কালক্রমে সুসভ্য ও সুসংস্কৃতিমান হয়ে ভারতকে চীনকে জাপানকে প্রেরণা জোগাবে। এটা যে সম্ভব হলো তার কারণ এসব দেশের রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেণ্ট। ভারতে ঠিক এই জিনিস্‌টির অভাব ছিল। চীন জাপানেও।

ষষ্ঠ যুগ আমাদের উনবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ। এ যুগ এখনো সমাপ্ত হয়নি। যে জাগরণ এসেছে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শেষ প্রতিভূ তিনি নন। মাত্র দুশো বছরে একটা সাংস্কৃতিক যুগের অবসান হয় না। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সম্ভাব্যতা এখনো নিঃশেষিত হয়নি। হতে পারে যে মধ্যবিত্তরা অবক্ষয়গ্রস্ত। কিন্তু তাদের অবসাদ তো সারা দেশের জনগণের অবসাদ নয়। জনগণের দিকে তাকালে আমি অসীম সম্ভাবনা দেখতে পাই। যুগ এখনো অসমাপ্ত। এখন শুধু পশ্চিম ইউরোপ থেকে নয় পৃথিবীর সব দিক থেকে প্রেরণা আসছে। আমাদের সৃষ্টি বাইরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর পরে আসবে সপ্তম যুগ। জনগণের ভিতর থেকে উদ্ভব হবে নতুন সংস্কৃতির।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের অতীতকালের শিক্ষা-ব্যবস্থার থেকে বিবর্তিত হয়নি। সে ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক ব্যবস্থা। ইউরোপের মতো এদেশেও অচলায়তন সৃষ্টি করেছিল। পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সে ব্যবস্থা যেমন ইউরোপে রহিত হয় তেমনি এদেশেও। তার জায়গা নেয় আধুনিক যুগোপযোগী মানবিকবাদী এই ব্যবস্থা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাশীলরা এর পক্ষপাতী ছিলেন। আশুতোষ তো ছিলেনই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন না পেলে এ ব্যবস্থা কখনো এতকাল টিকে থাকত না। আমরা পাঁচ পুরুষ ধরে এই ব্যবস্থায় মানুষ বা অমানুষ হয়েছি।

এ ব্যবস্থা যুগোপযোগী হতে পারে, কিন্তু দেশোপযোগী নয়, সমালোচকদের এই ছিল এক নম্বর নালিশ। স্বাধীনতার আগের দিন পর্যন্ত এ নালিশ শোনা গেছে, কিন্তু স্বাধীনতার পরেও যখন দেখা গেল যে গ্রামে গ্রামে এই ব্যবস্থাই ছড়িয়ে পড়েছে, দেশজ কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নয়, তখন বোঝা গেল অশিক্ষিত অমধ্যবিত্তরাও এর সমর্থক।

দু'নম্বর নালিশ ছিল এ ব্যবস্থা গণোপযোগী নয়। জনগণের

চাই এমন এক শিক্ষা যাতে মাথার সঙ্গে সমানে খাটবে হাত। ওরাও যদি হাতের অনুশীলন ভুলে যায় তো ক্ষেতখামার কল-কারখানা কোথাও কিছু গড়ে উঠবে না, উৎপন্ন হবে না। বাবুসমাজ মাথার অনুশীলন করে এই বুনিয়াদী সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তার জন্যে চাই বুনিয়াদী শিক্ষা। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা তাঁর সঙ্গে সহমরণে গেছে, সেই নামে যা চলছে তাকে সেই বস্তু বলা সঙ্গত নয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে যারা বেরিয়ে আসছে তারাও বাবু হতে চায়। তাদের দেখে চেনা যায় না যে তারা কামার কুমোর তাঁতী ছুতোর ইত্যাদির মতো জনগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। চাষবাসের শরিকও নয় তারা।

আজকের সমাজে হাতের চেয়ে মাথার কদর বেশী এটা প্রমাণ করা শক্ত। আমরা দেখছি একজন মিস্ত্রি যা রোজগার করে তা একজন দারোগার চেয়ে কম নয়। একজন মুদির রোজগার একজন হাকিমের চেয়ে বেশী। এরা কেউ ট্যাক্স দেয় না। তাই আরো স্বচ্ছল। নিজেরা স্কুল কলেজে যায়নি বলে এদের মনে একপ্রকার হীনতাবোধ আছে। সেইজন্যে ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠায়। যাতে সমাজে উঠতে পারে। শুনতে পাই ইংরেজীর মাধ্যমই এদের পছন্দ। তার জন্যে মোটা স্কুল ফী জোগায়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যেমন মাথাভারী হয়ে উঠছে তাতে এর সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হওয়া সম্ভব নয়। আমিও চিন্তালকু। কিন্তু

সেই যে একটা কথা আছে, "হাতীঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল ?" শিক্ষা জগতে আমি একটি মশা। আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সজাগ। তাই মূল সমস্যায় সাধারণত কণ্ঠক্ষেপ করিনে। শাখা সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে দুটি একটি কথা বলি। যদি তার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক থাকে।

আমি সংস্কৃতির রাজ্যের লোক। আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি হচ্ছে একপ্রকার গঙ্গাসাগর সঙ্গম। এতে যেমন স্বদেশের গঙ্গা আছে তেমনি আছে স্বকালের সাগর, যে-সাগর সারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অবধি প্রসারিত। গঙ্গাই শুধু থাকবে, সাগরকে বর্জন করতে হবে, এ প্রস্তাবে আমি কোনো-দিন রাজী হইনি, কোনোদিন হব না। কারণ এতে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির ক্ষতি করবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমুদ্র-যাত্রা বারণ করেছিলেন, পাছে আমাদের জাত যায়। সেই আত্মঘাতী ব্যবস্থা যদি আজ অবধি বলবৎ থাকত তাহলে হয়তো আমাদের জাত থাকত, কিন্তু আমরা জাতি হতে পারতুম না, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতুম না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কল্কে পেতুম না। সেই আত্মঘাতী ব্যবস্থাকে খিড়কির দরজা দিয়ে আবার ঘরে নিয়ে আসছেন যাঁরা তাঁরা কি জানেন সংস্কৃতির উপর এর প্রতিক্রিয়া কী হবে ? তেমন এক কূপমণ্ডুক সংস্কৃতি নিয়ে কোথায় আমরা দাঁড়াব ? অষ্টাদশ শতাব্দীতে ?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

অনেকদিন থেকে আমি ভাবছি, কিন্তু লিখতে ভরসা পাচ্ছিনে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার বর্তমান আকারে আর চলতে পারে না। হয় তাকে বিকেন্দ্রীকৃত হতে হবে, নয় তাকে দু'ভাগে বিভক্ত হতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণের রকমারি প্রস্তাব সম্প্রতি উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে যদি কাজ হয় তবে বিভক্তী-করণের প্রয়োজন হবে না। আমিও অত বড়ো একটা সীরিয়াস অপারেশন প্রস্তাব করব না।

কিন্তু আমার সত্যি সত্যি বিশ্বাস হয় না যে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে পড়াশুনার ও পরীক্ষার মান উন্নত হবে, ডিগ্রীর অবমূল্যায়ন রোধ হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাওয়া ছাত্ররা অন্যত্র কল্‌কে পাবে। সেইজন্যে আমি সময় থাকতে বিভক্তীকরণের স্বপক্ষে দু'টি একটি কথা নিবেদন করতে চাই। করতে ভরসা পাচ্ছি আরেকজনের লেখা পড়ে। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে প্রেসিডেন্সী কলেজকে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হোক। সেটি হোক একাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

আমার নিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয় হবে দুটি। একটির বাহন ইংরেজী। প্রেসিডেন্সী কলেজ তথা তারই মতো আরো

কয়েকটি কলেজ হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল। অপরটির বাহন বাংলা। অবশিষ্ট কলেজগুলি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল। কোন কলেজ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল হবে সেটা স্থির করবে সেই কলেজের ছাত্ররা। তাদের ভোট নেওয়া হবে। যারা বাংলা চায় তারা একদিকে। যারা ইংরেজী চায় তারা অন্যদিকে। ভোটে যারা হেরে যাবে তারা কলেজ পরিবর্তন করতে পারবে। প্রেসিডেন্সী কলেজ যদি ইংরেজী বাহনের পক্ষে ভোট দেয় তবে বাংলার পক্ষপাতীরা ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্যান্য কলেজে ভর্তি হবে। তেমনি বিদ্যাসাগর কলেজ যদি বাংলার পক্ষে ভোট দেয় তবে ইংরেজীর পক্ষপাতীরা প্রেসিডেন্সীতে বা তার মতো ইংরেজী মাধ্যম কলেজে স্থানান্তর চাইবে।

একবার এই ভাগাভাগির পালা শেষ হলে পরে দুই বিশ্ববিদ্যালয় যে যার রুচি অনুসারে নিয়ম কানুন প্রবর্তন বা পরিবর্তন করবে। ছাত্ররা সেটা মেনে নেবে। পুরাতন ঐতিহ্য কারো পক্ষে বলবৎ হবে না। নতুন করে আরম্ভ করার সুযোগ উভয়েই পাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নামটাও ভাগ হয়ে যেতে পারে। কলকাতা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন প্রাগ নগরের চেক বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়। হিন্দীর জন্যে তৃতীয় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করা যেতে পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা জানতেন না যে কালক্রমে এর কলেজ সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা ও পঠনীয় বিষয়সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা নেবে না, পড়ানোরও দায়িত্ব নেবে। টীচিং ইউনিভার্সিটি হবে। মাধ্যমের প্রশ্নও দিন দিন তীব্র হবে। আজকাল স্কুলের মাধ্যম কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে সর্বত্র বাংলা। অথচ কলেজে সেই সনাতন ইংরেজী। বাংলা মাধ্যম স্কুল থেকে যারা বেরিয়েছে তারা বাংলায় পড়তে চায়, প্রশ্নপত্র চায়, উত্তর দিতে চায়। তাদের সে ইচ্ছা আংশিকভাবে পূরণ করা হলেও ইংরেজীর মতো মর্যাদার সঙ্গে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের খাতিরে পুরোপুরি বঙ্গীকৃত করা দরকার। কিন্তু সে পথে কয়েকটি বাধা আছে।

প্রথমত, এমন অনেক বাঙালীর ছেলে আছে, অবাঙালীর ছেলে তো আছেই, যাদের দিক থেকে ইংরেজীই বেশী সুবিধের। ইংরেজীতে অসংখ্য বই পাওয়া যায়, অনুবাদের আশায় বসে থাকতে হয় না। অনুবাদও তো দু'চার বছরের মধ্যে সেকেলে হয়ে যায়। বি. এ., এম. এ. প্রভৃতি ডিগ্রীগুলি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসূচক ডিগ্রী। ইংরেজী মাধ্যমের মান অনেকটা আন্তর্জাতিক মান। বাংলা মাধ্যমের মান কি অতটা উঁচু হবে? সময় ও অর্থ ব্যয় করে কেন নিরেস ডিগ্রী নেওয়া? তাতে কি ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান সুগম হবে? এসব ছাত্রদের প্রতিও সমাজের দায়িত্ব আছে। এরা বাইরে গিয়ে প্রতিযোগিতায়

নামবে। এদের জন্যে ইংরেজী মাধ্যম স্কুল যদি থাকে কলেজও থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়ও থাকবে।

দ্বিতীয়ত, একটি ছাত্র বাংলা মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছে শুনলেই বাংলার বাইরে তাকে না নেবে কেউ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, না দেবে কেউ চাকরি। যদি না সে প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পশ্চিমবঙ্গ কতটুকু জায়গা! আর সেখানকার প্রাইভেট সেকটরটিও তো অবাঙালীদের দখলে। পড়াশুনার মান নেমে গেলে, পরীক্ষার মূল্য কমে গেলে বি. এ., এম. এ. ডিগ্রীর কদরও হবে কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থের মতো।

আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাই বিদেশ থেকে আমদানী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা। এটি জাতীয় ব্যবস্থা নয়। আমরা যদি এর খোল নলচে বদলে দিই তা হলে বাইরের লোক আমাদের আধুনিকতায় সন্দেহ পোষণ করবে। আমাদের ছাত্রদের আরেক দফা পরীক্ষা করে দেখবে তারা সত্যিই যোগ্য কি না। এরা কি সে পরীক্ষায় দেশের মান রাখতে পারবে?

তা সত্ত্বেও আমি বাংলা মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ও রাখতে হবে। ছাত্রদের যেখানে খুশি পড়বার অধিকার মেনে নিতে হবে। যেমন স্কুলের বেলা মেনে নেওয়া হয়েছে। কলকাতায় ইংরেজী মাধ্যম সরকারী স্কুল নেই, বেসরকারী স্কুল আছে, সেখানে দিব্যি ভিড়। বোঝা যায় চাহিদা আছে।

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় যে সময় প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময় খোদ ইংলণ্ডেই তিনটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ ও লণ্ডন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডেও বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে জার্মানীতে, জাপানে। যতদূর মনে পড়ছে এক টোকিওতেই সতেরোটি কি আঠারোটি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি বড়ো মাপের কলেজ, যেখানে পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগও থাকে। গবেষণার ব্যবস্থাও থাকে। যার যার নিজের দেওয়া ডিগ্রী। জিজ্ঞাসা করিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মান সমান কি অসমান।

টোকিওর অনুসরণ করলে কলকাতার বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী, সিটি, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কলেজগুলিতে পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগ খুলে সেগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করা যায়। কিন্তু ততদূর আমি যাব না। আমি শুধু বলব কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগটিকেও দুই ভাগে ভাগ করতে। কলকাতা বাংলা ও কলকাতা ইংরেজী এই হবে নামকরণ। নামকরণ থেকেই বোঝা যাবে কেন এই ভাগকরণ। বাংলাকে তার উপযুক্ত মর্যাদা না দিলেই নয়। বাংলাদেশে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও দিতে হবে। জনমত সেইদিকেই যাচ্ছে। ওকালতী যদি

করতে হয় ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই করতে হবে। কলকাতা একটি সর্বভারতীয় নগরী।

যেমন দেখা যাচ্ছে ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় সারা ভারতে পাঁচটির বেশী থাকবে না। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী সম্বন্ধে মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারা যায়। বেনারস ও আলীগড় সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আমার ধারণা ওর আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্যে ওখানে ইংরেজী মাধ্যমই চলবে। বাংলা যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাও আশঙ্কা করেন যে ইংরেজী মাধ্যম উঠে গেলে হিন্দী উড়ে এসে জুড়ে বসবে। হিন্দীর জন্যে তাঁরা প্রস্তুত নন। বিশ্বভারতীকে বাংলা মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণত করতে হলে তাকে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের আমলে আনতে হবে। বাংলা মাধ্যম হলে সে আর কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে থাকবে না। তা হলে ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যলয়ের সংখ্যা আরো একটি কমবে।

আমার বিশ্বাস ইংরেজীর পক্ষেও জনমতের একাংশ রয়েছে। ভারতের মতো বহুভাষী রাষ্ট্রে হিন্দীই একমাত্র যোগসূত্র হতে পারে না, ইংরেজীকেও অন্যতম যোগসূত্ররূপে রাখতে হবে, অন্তত নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর খাতিরে। শুনছি শিলংয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। সেটি যে ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় হবে এতে সন্দেহ নেই। পার্বত্য ভাষাগুলি যথেষ্ট উন্নত নয়। হিন্দীও কেউ

চায় না। এই একটি ক্ষেত্রে ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় অপরিহার্য, সুতরাং চিরস্থায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বজ্ঞান বিতরণের তথা অর্জনের জন্যে। সকলের জন্যেই বিশ্বজ্ঞান, কিন্তু কার্যত সমাজের অতি অল্পসংখ্যক তরুণতরুণীরই তাতে আন্তরিক আগ্রহ। অধিকাংশের দৃষ্টি জীবিকার উপরে অথবা ডিগ্রীর থেকে যে মর্যাদা আসে সেই মর্যাদার উপরে। জীবিকার অন্য কোনো ব্যবস্থা হলে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াবে না। কিন্তু মর্যাদার অন্য কোনো বিকল্প নেই। মর্যাদার জন্যে বিস্তর ছাত্র ছাত্রী জীবিকার অপর কোনো ব্যবস্থায় আকৃষ্ট না হয়ে বিশ্ববিদ্যলয়ে এসে ভিড় করবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে মর্যাদার রাজটীকা নিয়ে জীবিকার সন্ধানে বেরোবে। এটাই এখনকার আন্তর্জাতিক রীতি। রাশিয়া ও চীনও এই সমস্যার থেকে মুক্ত নয়।

ডিগ্রী এখন সব দেশেই স্টেটাস সিম্বল। আফ্রিকাই হোক আর এশিয়াই হোক প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিদের নামের আগে দেখি "ডক্টর"। যাঁরা রীতিমতো পড়াশুনা করে ওই ডিগ্রী পাননি তাঁরা পেয়েছেন সম্মানস্বরূপ। এর থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্বান বা ময়ুরপচ্ছধারী বিদ্বানদের কত সম্মান। ছেলে-মেয়েরা যদি একধার থেকে ডক্টর হতে চায় তা হলে আশ্চর্য হবার কী আছে! দিল্লীর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় যে

ছেলেটি প্রথম হয়েছে সে বলেছে তার লক্ষ্য বাইশ বছর বয়সে ডক্টর হয়ে তারপরে আই এ এস পরীক্ষায় বসা। অর্থাৎ সে চীনদেশের মান্দারিনদের ঐতিহ্য অনুসরণ করবে।

ওদিকে গণচীন পণ করেছে মান্দারিন কাউকে হতে দেবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পাবার আগে প্রত্যেককে প্রমাণ করতে হবে যে সে তিন বছর না চার বছর ক্ষেতে খামারে বা কারখানায় হাতে কলমে কাজ শিখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহ অধিকাংশেরই মিটে যাবে, যাদের থাকবে তারাও আবার সেই ক্ষেতখামার বা কারখানায় ফিরে গিয়ে জীবিকা অর্জন করবে। এটাও একপ্রকার পরিবার পরিকল্পনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ বাড়তির দিকে যাবে না। বাছা বাছা ছাত্রছাত্রীরাই প্রবেশ পাবে।

আমরা যাকে পরীক্ষা বলি সেও তো একপ্রকার বাছাই। যতগুলো আসন খালি ততগুলি প্রার্থী থাকলে পরীক্ষার দরকার হতো না। সবাইকে ভর্তি করে নেওয়া যেত। কিন্তু প্রার্থীর সংখ্যা তার বহুগুণ। সেইজন্যেই পরীক্ষা অর্থাৎ বাছাই। পরীক্ষায় সবাইকে পাশ করিয়ে দিলে যে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন প্লাবিত হবে। অথচ ফেল করিয়ে দেওয়াও নিষ্ঠুরতা। জীবিকার অপর কোনো ব্যবস্থা করতেই হবে। তার জন্যে চাই কায়িক পরিশ্রমে রুচি। এমন কোন সমাজ নেই যে সমাজ লক্ষ লক্ষ মান্দারিনকে উৎপাদকমূলক কর্মে নিযুক্ত করতে পারে।

তা বলে কাউকেই মান্দারিন হতে দেওয়া হবে না এ নীতিও ঠিক নয়। বাছা বাছা ছাত্রছাত্রীদের মান্দারিন হতে না দিলে জ্ঞানের তপস্যা করবে কারা ?

যতগুলি ছাত্র ইস্কুলে পড়ে ততগুলি ছাত্র কলেজে পড়তে চাইলে কলেজের সংখ্যা বহুগুণ হওয়া চাই। সেটা সম্ভব নয় বলে সবাইকে কলেজে পড়তে দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র তাদেরি পড়তে দেওয়া হয় যারা ইস্কুলের পরীক্ষায় পাশ করেছে। আবার অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাদেরি যারা প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে।

তেমনি যতগুলি ছাত্র কলেজে পড়ে ততগুলি ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এম-এ, এম–এসসি পড়তে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুগুণ হওয়া চাই। সেটা সম্ভব নয় বলেই সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র তাদেরি পড়তে দেওয়া হয় যারা কলেজের পরীক্ষায় পাশ করেছে। আবার অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাদেরি যারা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে।

যাঁরা পরীক্ষা জিনিসটা বেবাক উঠিয়ে দিতে চান তাঁরা কি কলেজের সংখ্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুগুণ করতে চান? এমনিতেই ইস্কুলের ছাত্রদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে। তখন প্রাথমিক ছাত্রদের সংখ্যা এখনকার চার পাঁচগুণ হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও অন্যান্য দেশে প্রাথমিকের মতোই সার্বজনীন। এদেশেও তার দরকার হবে। তখন মাধ্যমিক ছাত্রদের সংখ্যা এখনকার আট দশগুণ হবে।

বিনা পরীক্ষায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ ধাপটি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু কলেজে ওঠার সময় পরীক্ষা অনিবার্য। নইলে কলেজের সংখ্যা এখনকার বিশ পঁচিশগুণ হবে। প্রত্যেকটি প্রাথমিক ছাত্র যদি দাবী করে যে তাকে বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখনকার শতগুণ হবে।

দেশের ধনসম্পদ কত বেশী হলে এটা সম্ভব হবে ভেবে দেখেছেন কি? যদি ভেবে দেখেন তবে কোনো এক জায়গায় লাইন টানতেই হবে। বিনা পরীক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা চলতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষাও চালাতে চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু বিনা পরীক্ষায় কলেজের শিক্ষা কোনো দেশেই চলতি হয়নি, হয়ে থাকলে আমার জানা নেই। সংখ্যা যদি নির্দিষ্ট হয় তবে পরীক্ষা ছাড়া উপায় নেই। সেকেণ্ডারি বোর্ড যদি পরীক্ষা না করে প্রত্যেকটি কলেজ নিজের মতো করে পরীক্ষা করে নেবে। সে পরীক্ষায় সবাই পাশ করবে না, কলেজে যতগুলি সীট ততগুলি পাশ করবে। তেমনি প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের

মতো করলে সে পরীক্ষাতেও সবাই পাশ করবে না। নয়তো চাকরিক্ষেত্রে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে দেওয়া মানেই বেকার সংখ্যা বাড়তে দেওয়া। সমাজ যেদিন সবাইকে চাকরি বা স্বাধীন জীবিকা জোগাতে পারবে সেদিন কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংখ্যা আপনা থেকেই বাড়বে। আপাতত অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। পরীক্ষা নামক প্রথাটি একেবারে তুলে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে সেটিকে যথাসম্ভব সদয় ও সৎ করতে হবে। ছাত্রদের একথাও বোঝাতে হবে যে পরীক্ষা জিনিসটা তাদের স্বার্থেই অনুষ্ঠিত হয়। নয়তো তাদের অনেক রকম ঝামেলা পোহাতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ কখনো সবাইকে জায়গা দেবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও না। চাকরি-দাতারাও না। যোগ্যতার বিচার করে তারপর জায়গা দেবেন।

পরীক্ষার ফলে কতক ছাত্রকে গোড়া থেকেই ছাঁটাই করতে হবে, এটা একটা অপ্রিয় কর্তব্য। তাদের জন্যে কারিগরি শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, সামরিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপক আয়োজন চাই। তা হলে ফেল করা ছাত্ররাও জীবনে সফল হতে পারবে। জীবনের সাফল্যটাই তো আসল। পরীক্ষায় সাফল্যটা জীবনের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে বলেই মূল্যবান। কিন্তু সব সময় করে কি? করলে এত পাশ করা ছেলে বেকার হতো কেন?

শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক

শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এই নিয়ে ত্রয়ী। আমরা সাধারণত একদেশদর্শী। হয় শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে বা তুচ্ছ করে ভাবি। নয় শিক্ষকদের সংখ্যানুপাত ও প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান উপেক্ষা করে ভাবি। শিক্ষার্থীদের উপর পাঠ্যপুস্তকের যে বোঝাটি চাপানো হয় সেটি তারা পশু হয়ে থাকলে পশুক্লেশ-নিবারণী আইনের আমলে আসত। ছাত্রক্লেশনিবারণী আইন না থাকায় কর্তৃপক্ষ যা খুশি করে যাচ্ছেন। ছাত্ররাও এতদিনে বিদ্রোহ করতে শিখেছে। তাদের বিদ্রোহ এখন ধ্বংসের পথ ধরেছে।

শিক্ষকরাও যে প্রকারান্তরে বিদ্রোহী নন তা নয়। আমাদের রাজস্বের সিংহের ভাগ চলে যায় সৈন্য ও পুলিশ বিভাগে। সে খরচ না কমালে শিক্ষার জন্যে খরচ বাড়ানো শক্ত। লোকে শিক্ষার জন্যে নতুন একটা কর দিতে উৎসাহী নয়। তবে ওদের যদি ব্যাপকভাবে মদ, গাঁজা, আফিং, চরস ধরানো যায় তা হলে অবশ্য প্রচুর টাকা শিক্ষার খাতে খরচ করা চলে। ইতিমধ্যে সেই উপায়েই শিক্ষাবিস্তার হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাবিস্তার যেমন

হয়েছে অপরাধবিস্তারও তেমনি হয়েছে। তার ফলে পুলিশ বিস্তার, আদালত বিস্তার, জেল বিস্তার।

শিক্ষকদের জানা উচিত যে শিক্ষার সঙ্গে আরো দশটা প্রশ্নও গভীরভাবে জড়িত। যে দেশের লোক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অহিংস উপায় জানে সে দেশের পুলিশ ও সৈন্য ব্যবস্থা এত বেশী ব্যয়সাপেক্ষ হয় না। কাজেই শিক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা খরচ করতে পারা যায়। তার জন্যে যত্র তত্র মদের দোকান খুলতে হয় না। নাবালকদেরও মদ খেতে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। অহিংসা একটা পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। ব্যবহারিক জগতে এর আবশ্যকতা আছে বলেই আমি অহিংসায় বিশ্বাসী। দেশের লোক যতই এর থেকে সরে যাচ্ছে ততই আমাদের সমস্যাগুলো জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এর পরে হয়তো দেখা যাবে যে ছাত্ররাই শিক্ষকদের শিক্ষক হয়ে বসেছে ও বেতনদানের বদলে বেত্রদান করছে। তখন প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে থানা বসাতে হবে।

যে ত্রয়ীর উল্লেখ করেছি তার সুষ্ঠু সমন্বয় চাই। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করুন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মত শুনুন। পারস্পরিক বিচার বিশ্লেষণের ফলেই একটি উন্নততর ব্যবস্থার বিবর্তন হবে।

লোকশিক্ষা

যে দেশ সুদীর্ঘকাল পরাধীন থেকে অবশেষে একদিন মুক্তি পেয়েছে তার প্রধান চিন্তা হওয়া উচিত আর যাতে পরাধীন হতে না হয় তার জন্যে আটঘাট বাঁধা। স্বাধীনতার প্রাক্কাল হতেই এ চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি ভাবতুম স্বাধীন হয়ে আমাদের প্রথম কাজ হবে শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া। বিশেষ করে লোকশিক্ষার উপরে। যে দেশের জনগণ শিক্ষার আলো পেয়েছে সে দেশ সহজে পরাধীনতা স্বীকার করবে না। তার থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বার করবে। সে উপায় সশস্ত্র না হয়ে নিরস্ত্র হতেও পারে। কিন্তু যে দেশের জনগণ অজ্ঞ তারা একেবারেই নিরুপায়।

আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ নিরক্ষর ছিলেন। এর থেকে ধারণা জন্মাতে পারে যে রাম শ্যাম যদু মধুও নিরক্ষর থাকলে ক্ষতি নেই, তারাও তেমনি যোদ্ধা হবে। বণিকদের মধ্যেও নিরক্ষরতা লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও লক্ষপতি কোটিপতি হতে তাঁদের বাধেনি। বাধবে কি কেবল রাম শ্যাম

যত্ন মধুর বেলা ? খবর নিলে জানা যাবে যে মন্দিরনির্মাতা প্রাসাদনির্মাতারাও নিরক্ষর ছিলেন। কারিগর শ্রেণীর লোক নিরক্ষর হয়েও সৌন্দর্যসৃষ্টি করেছে। কৃষক শ্রেণীর লোক নিরক্ষর হয়েও সোনা ফলিয়েছে।

এসব ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শিক্ষা মানেই অক্ষর পরিচয়, অক্ষরপরিচয় মানেই শিক্ষা। আসলে তা নয়। শুনেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বেদ কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি। স্যার উইলিয়াম জোন্‌স উদ্যোগী না হলে লিপিবদ্ধ হতো না। চিরকাল মুখে মুখেই সংরক্ষিত হয়ে এসেছিল, মুখে মুখেই সংরক্ষিত হতো। তবে কি বলতে হবে যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা ছিলেন অশিক্ষিত ? একজন মানুষ চক্ষুর মাধ্যমে শেখে, একজন শেখে কর্ণের মাধ্যমে। দুটোই শিক্ষা। ছাপাখানা যখন ছিল না, খুব কম লোকই বই পড়ে শিখত, বেশীর ভাগই শিখত যাত্রা দেখে, কথকতা শুনে। আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহেরও অস্ত্রশিক্ষা হয়েছিল। শাস্ত্রশিক্ষার মতো অস্ত্রশিক্ষাও একপ্রকার শিক্ষা। কৃষক শ্রমিক কারিগর যে যার বৃত্তি শিখত গুরুজনের কাছে, গুরুর কাছে। ব্যবসায়ীরা দোকানে বসে হাতে কলমে শিখত। শিক্ষানবীশীও শিক্ষা।

একালে আমরা ধরে নিয়েছি যে স্কুল কলেজে না গেলে শিক্ষা হয় না। সেইজন্যে স্কুল কলেজ স্থাপন করতে লেগে গেছি। দেশের পঞ্চাশ কোটিকে স্কুল কলেজে পড়ানো কি

কোনো কালে সম্ভব ? স্বাধীনতা যদি স্কুল কলেজের উপর নির্ভর করে তবে কি তা আমাদের কপালে বেশী দিন টিকবে ?

স্কুল কলেজ থাকবেই, তাদের সংখ্যাও থাকবে। কিন্তু কোনোদিনই এমন অবস্থা হবে না যেদিন দেশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে হাই স্কুলে পড়ছে, কলেজে পড়ছে, পাশ করে বেরিয়ে এসে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশকেই লাঙল ধরতে না হোক ট্রাক্টর চালাতে হবে। তাঁত বুনতে না হোক কাপড়ের কলে কাজ করতে হবে। খনিতে নেমে লোহা তুলে আনতে হবে, নল বসিয়ে খনিজ তৈল তুলতে হবে। যেখানে শতকরা নব্বই জন কায়িক শ্রমসাধ্য নিত্যকর্মে ব্যাপৃত সেখানে বাকী দশজন মানসিক শ্রমসাধ্য কর্মে নিযুক্ত হতে পারে। তাদের বেশীর ভাগই করণিক বা দোকানের কর্মচারী। অল্প কয়েকজন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, মাস্টার, উকিল, এঞ্জিনীয়ার, সিভিল অফিসার, মিলিটারি অফিসার, সওদাগরী অফিসার, কারখানার মালিক, কোম্পানীর ডাইরেকটার, দোকানদার বা ঠিকাদার।

সমাজের এই গড়ন সমাজতন্ত্রও রাতারাতি উল্টিয়ে দিতে পারবে না। সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে এখনো সেটা সম্ভব হয়নি। এখনো তারা ওলটপালটের সমস্যায় জর্জর। চেকোস্লোভাকিয়ার নয়া এঞ্জিজিনীয়ার শ্রেণী বলে, "আমরা এত লেখাপড়া শিখে এত মাথা খাটিয়ে পাই মাসে বাইশ শো মুদ্রা আর ওরা সামান্য পড়াশুনা করে নিছক গতর খাটিয়ে পাবে মাসে আঠারো শো

মুদ্রা ! মাথা খাটানো আর গতর খাটানোর মাঝখানে এত স্বল্প ব্যবধান ! এই কি আমাদের সামাজিক ন্যায় !” চেকো-স্লোভাকিয়ার এই বিতর্ক বাইরের কমিউনিস্ট শক্তিরা সৈন্য পাঠিয়ে দেশ দখল করে থামিয়ে রেখেছে। সৈন্য একদিন ফিরে যাবে। তখন আবার বিতণ্ডা। চীনারাও এই নিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। বিপ্লব একবার হয়েই চুকে যায় না। বার বার হয়। যতদিন না সম্পূর্ণ সাম্য আসছে ততদিন বিপ্লবের বিরাম নেই। সম্পূর্ণ সাম্য কি কোনোদিন আসবে ? মাথার কাজ আর গতরের কাজ কি একদর হবে ? মুড়ি মিছরির এক দর কি সম্ভব ? সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে ত্যাগের দ্বারা করতে হবে।

এসব কথা মনে রেখে লোকশিক্ষার আয়োজন করতে হবে। একই প্রকার শিক্ষা সকলের জন্যে নয়। তবে কতকগুলো বিষয়ে কতকদূর জ্ঞান সকলের জন্যেই। অজ্ঞানের অন্ধকারে কোনো মানুষকেই রাখা চলবে না। যাত্রা কথকতা রেডিও সিনেমার সাহায্যে সবাইকে মোটামুটি শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যদিও সবাই ইনটেলেকচুয়াল বলে বিদিত হবে না। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের মতো মোটা শিক্ষা সকলের ভাগেই জুটবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যতীত আর কোনো স্কুলে না গিয়েও যাতে এটা সম্ভব হয় তার জন্যে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদের মতো প্রতিষ্ঠান সর্বত্র গড়ে তোলা দরকার।

বাংলা প্রবর্তন

সরকারী বেসরকারী আপিস আদালত কোম্পানী কর্পোরেশন প্রভৃতিতে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা প্রবর্তন করতে হবে এ দাবী আজকের নয়। স্বাধীনতার সময় থেকেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কাজ বেশীদূর এগোয়নি। কেন, তা ভেবে দেখা দরকার।

বাংলা প্রবর্তনের প্রস্তাব উঠলেই আমরা সর্বপ্রথমে তৈরি করতে বসে যাই পারিভাষিক শব্দ। তার জন্যে গ্রামে যাইনে, গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলিনে, বাংলার বহমান ধারায় ডুব দিইনে। বাংলাভাষার পুঁথিপত্রও ঘাঁটিনে। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ অবধি আমাদের দৌড় তেমনি ইঙ্গসংস্কৃত অভিধান অবধি। আপ্‌টে প্রমুখ মরাঠী পণ্ডিত ইরেজীর প্রতিশব্দ যেমনটি লিখেছেন আমরাও তারই অনুরূপ রচনা করি। আর তারই নাম দিই বাংলা পারিভাষিক শব্দ।

ইতিমধ্যে ইংরেজী শব্দের সঙ্গে আমাদের দেশবাসীর পরিচয় দেড়শো কি দুশো বছর ধরে হয়েছে। বহু ইংরেজী শব্দ লোকমুখে তৎসম বা তদ্‌ভব হয়ে গেছে। ত্যদের বদলে সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টির সত্যিকার প্রয়োজনই নেই। আমাদের উদ্দেশ্য যদি

হয় ইংরেজীর বদলে বাংলা তা হলে সংস্কৃতর কাছেই বা আমরা যাব কেন? তা হলে কি আমাদের লক্ষ্য বাংলা প্রবর্তন নয়, সংস্কৃত পুনঃপ্রবর্তন? সে চেষ্টা জনাকতক পণ্ডিতের প্রীতিবর্ধন করতে পারে, কিন্তু আজকের দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে না। সাধারণ লোক কংগ্রেসকে বা যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেয়, সি. পি. আই বা সি. পি. আই. এম-এর সভায় যায়। করুন দেখি এগুলির সংস্কৃত ভাষান্তর। কেউ গ্রহণ করবে না। তেমনি ওরা ট্রামে বাসে চড়বে, রেলের স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটবে, তারপর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ট্রেন ধরবে, ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক ভাঙাবে, দোকানে গিয়ে নোট ভাঙাবে, ব্যালান্স মিলিয়ে নেবে। শেখান দেখি ওদের সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ।

অসংখ্য ইংরেজী শব্দ বাঙালীর মুখে থাকতে এসেছে। সুতরাং লেখনীর মুখেও থাকবে। তার পরিবর্তে সংস্কৃত কেউ মেনে নেবে না। অভিধানের শব্দ অভিধানেই থেকে যাবে। জীবনে প্রচলিত হবে না। সরকারের কাজকর্ম কি প্রচলিতকে নিয়ে, না অচলিতকে নিয়ে? সরকারী বাংলা কি কাজ চালানোর জন্যে, না শোভাবর্ধনের জন্যে? যদি কাজ চালানোকেই অগ্রাধিকার দিতে হয় তবে কথায় কথায় সংস্কৃত অচলিত শব্দের আশ্রয় না নিয়ে ইংরেজী চলিত শব্দের আশ্রয় নিতে হয়।

পারিভাষিক শব্দ তৈরি করার ভার বাইশ বছর আগে যাঁদের উপর পড়েছিল তাঁরা কেবল ইংরেজীর নয়, আরবী ফারসীরও

পারিভাষিক শব্দ বানাতে আরম্ভ করেন। মুনসেফ কথাটি ইংরেজীও নয়, ইংরেজদের সৃষ্টিও নয়। অথচ তারও একটি সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ চাই। এর মানে কী? মুসলমানী আমলটাকেই প্রক্ষিপ্ত বলে অস্বীকার করা? তা হলে তো দেওয়ানী ফৌজদারি জমিদারি আইনকানুনের ভাষা বেবাক বদলাতে হয়। উকিল মোক্তার সেরেস্তাদার নাজির পেশকার পেয়াদা চৌকিদার খাজাঞ্চি পোদ্দার প্রভৃতি ইংরেজ আমলের দেড়শো দু'শো বছরেও বিলুপ্ত হয়নি। এবার তা হলে তারা পণ্ডিতদের কোপানলে ভস্ম হবে।

লোকের মনে যে পরিমাণ ইংরেজবিদ্বেষ ছিল সে পরিমাণ ইংরেজীবিদ্বেষ ছিল না। তেমনি যে পরিমাণ মুসলমানবিদ্বেষ ছিল সে পরিমাণ আরবীফারসী বিদ্বেষ ছিল না। সুতরাং লোকে তাদের পরিচিত ভাষাকে রাজভাষা বলে রাজার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দেয়নি। নিজেদের প্রয়োজনেই ভাণ্ডারে মজুত করে রেখেছে। এটাই সব দেশের রীতি। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এর নজীর আছে। রোমানদের বিদায়ের পরেও রোমান আইন ও লাটিন ভাষা থেকে যায়। নর্মান বিজয়ের পর ফরাসী ভাষা ও ফরাসী আচার এল। এখনো কি তার জের মিটেছে? লাট-সাহেবের সঙ্গে আহারের নিমন্ত্রণ যতবারই পেয়েছি ততবারই দেখেছি মেনু ছাপা হয়েছে ফরাসী ভাষায়।

সব কিছু বিশুদ্ধ সংস্কৃত করতে গেলে তাই হবে যা হয়েছে

হিন্দীর বেলা। ইংরেজীকে তাড়াবার নাম করে সে আরবী ফারসীকে তাড়াচ্ছে। উর্দুর সঙ্গে তার এখন শত্রু সম্পর্ক। এর ফলে হিন্দীর বিবর্তন হাজার বছর পিছিয়েই যাচ্ছে। কী করে সে অগ্রসর চিন্তাকে ধারণ করবে? যার চোখ সামনের দিকে আর পা পেছনের দিকে তার প্রগতিকে ব্যাহত করে তার পশ্চাদ্‌গতি। বাংলা যে হিন্দীর পথ এখনো ধরেনি তার কারণ বাংলার ঐতিহ্য যাবনীমিশাল। ভারতচন্দ্রই পথ নির্দেশ করে দিয়ে যান। কিন্তু পারিভাষিক শব্দ তৈরি করার ভার যাঁদের উপর পড়বে তাঁদের যদি যাবনীমিশালে আপত্তি থাকে তা হলে বাংলার পথও হবে হিন্দীর মতো বিশুদ্ধ সংস্কৃত। সেটা আপাতত ইংরেজীর পরিবর্তে হলেও অতঃপর আরবী ফারসীর পরিবর্তেও হবে। বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও আমরা দ্বাদশ শতাব্দীর স্বাদ পাব। অমন করে ইতিহাসকে উজানমুখী করার চেষ্টায় সময় নষ্ট করার চেয়ে ইংরেজীকে চালু রাখাও ভালো।

পারিভাষিক শব্দের জন্যে মাথা না ঘামিয়ে হাতের কাছে যে শব্দ পাওয়া যায় সেই শব্দ দিয়ে কাজ চালানো গোছের বাংলায় সরকারী বেসরকারী চিঠিপত্র ও রিপোর্ট লেখা যদি সকলের সম্মতি পায় তবে কাল সকালেই বাংলা প্রবর্তন করতে পারা যায়। তার জন্যে অনির্দিষ্টকাল পদচারণ করতে হয় না। সে বাংলায় সংস্কৃত যেমন থাকবে তেমনি থাকবে আরবী ফারসী ও ইংরেজী। যেখানে যেটা মানায়।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে বাংলা ভাষায় কেন্দ্রের সঙ্গে পত্রব্যবহার চলবে না। তার জন্যে চাই ইংরেজী বা হিন্দী। তেমনি বাংলা ভাষায় বিহার সরকার বা আসাম সরকারের সঙ্গে পত্রব্যবহার চলবে না। তার জন্যেও চাই ইংরেজী বা হিন্দী। তেমনি বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক বা আন্তঃপ্রাদেশিক সওদাগরী সংস্থা বা শিল্পসংস্থার সঙ্গে পত্রব্যবহার চলবে না। সে ক্ষেত্রেও ইংরেজী বা হিন্দী। এমনি কয়েকটি ক্ষেত্র বা দ আর সব জায়গায় বাংলায় পত্রব্যবহার চলতে পারে। কলকাতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পত্রব্যবহার কেন যে ইংরেজীতে হবে তার কোনো কারণ নেই। কলকাতার মহাকরণের সঙ্গে বিভিন্ন ডাইরেক্টরেটের পত্রব্যবহার বাংলাতে না হয়ে ইংরেজীতে হতে বাধ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের পত্রব্যবহারও বাংলাতেই হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিভাগের সঙ্গে অপর বিভাগের পত্রব্যবহার বাংলাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেখানে আইন কানুনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার প্রয়োজন সেখানে অর্থাৎ হাইকোর্টে ও জেলাকোর্টে ইংরেজীর স্থান সামনের পঞ্চাশ বছরেও যাবার নয়। সেখানে যেটা সম্ভব সেটা একপ্রকার দ্বৈভাষিকতা। ইংরাজীতে ও বাংলাতে কাজকর্ম ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতে হবে। ইংরেজ রাজত্বেও বাংলা ছিল আদালতের ভাষা। জজকেও বাংলায় জুরিদের চার্জ বুঝিয়ে দিতে হতো। আসামীকে

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বুঝিয়ে দিতে হতো। যেখানে জজ বাংলায় বোঝাতে পারতেন না সেখানে বাংলায় বোঝাতেন তাঁর পেশকার। আমি তো উকিল মহাশয়দের বাংলাতেই সওয়াল করতে সুযোগ দিয়েছি, কিন্তু তাঁরা সে সুযোগ নেননি। তার কারণ তাঁদের মক্কেলরা ঠাওরাবে যে উকিল মহাশয়রা ইংরেজিতে কাঁচা। তাই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে হতো। জজ বাঙালী, উকিল বাঙালী, সাক্ষী বাঙালী, আসামী বাঙালী, অথচ সওয়াল চলছে ইংরেজীতে। এর জন্যে ইংরেজরা দায়ী নয়। বাংলাই ছিল আদালতের ভাষা। ইংরেজ-দেরও বাংলা শিখতে বাধ্য করা হতো। পরীক্ষা দিতে হতো। বাংলা আদালতের ভাষা তখনো ছিল, এখনো আছে।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি আইন আদালতের ক্ষেত্রে ইংরেজীও থাকবে, বাংলাও থাকবে, প্রত্যেকটি বিচারককে ভালো করে ইংরেজী শিখতেই হবে। প্রত্যেকটি উকিলকেও। কিন্তু কথায় কথায় ইংরেজী ব্যবহার করার সত্যি কোনো দরকার নেই। বরঞ্চ যত বেশী বাংলা ব্যবহার করা হয় তত ভালো। বিচারটা কী ভাবে হচ্ছে সাধারণ লোকের সেটা জানা উচিত। সুবিচার হলো, অথচ লোকে বুঝতে পারল না, এটা ন্যায়ক্ষেত্রের নীতি নয়। সুবিচারও হবে, লোকেও জানবে যে সুবিচার হলো, দুই একসঙ্গে চলবে। তার জন্যে বাংলাই প্রশস্ত। যেখানে সকলেই বাঙালী সেখানে বাংলাকে

তার অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু ইংরেজীকেও বজায় রাখতে হবে এই জন্যে যে আমাদের অসংখ্য আইন রাতারাতি বাংলায় তর্জমা করা যাবে না, তর্জমা করলেও তার সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করা যাবে না। তাছাড়া অসংখ্য নজির, অসংখ্য রুলিং রয়েছে ইংরেজীতে। বাংলায় সেসব তর্জমা করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। কারণ বাংলা বই ক'জন কিনবে? তর্জমার মজুরি পোষাবে না। এক একজন উকিলের চেম্বারে কী পরিমাণ আইনের কেতাব থাকে তা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। বাংলায় তর্জমা করার কথা ভাবা যায় না।

তারপর সব কিছু তর্জমার আইডিয়াটাই ভ্রান্ত। বাংলায় তর্জমা হলে যাঁরা এসব কিনবেন তাঁরা ইংরেজীও ভালো জানেন। ইংরেজী মূল গ্রন্থটাই তাঁদের কাছে প্রামাণিক। সেটাই তাঁরা কম দামে কিনবেন। মনে করুন, সারা ভারতের জন্যে ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড এক। বাজারে তার যে সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন হাইকোর্টের রুলিং দেওয়া থাকে। প্রতি বছরই সংস্করণ বদলে যায়। তার ইংরেজী সংস্করণ সারা ভারত জুড়ে বিক্রী। কিন্তু বাংলা তর্জমা ক' খানাই বা বিকোবে? কেন তা হলে কেউ বছর বছর সংস্করণ বার করবেন? করলে তার দাম হবে ডবল।

আইন আদালতের উপর ইংরেজীর প্রভাব এখনো দু'তিন পুরুষ ধরে চলবে। তার কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা নেই। তবে, হাঁ,

বিপ্লব যদি হয় তাহলে সব একদিনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! গোটা সীস্টেমটাই বদলাবে। কিন্তু তা যদি হয় আমাদের সংবিধানটাও কি থাকবে?

শুনতে পাই টাইপরাইটারের অভাবে বাংলা প্রবর্তন এগোতে পারছে না। সেটা অবশ্য একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ। কিন্তু কথায় কথায় টাইপরাইটার ব্যবহার না করে আগেকার মতো নকল-নবীশ নিয়োগ করা যেতে পারে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে 'সিভিলাইজেশন' ও 'কালচার' বলে ছুটো নতুন শব্দ বানানো হয়। তার মানে এ নয় যে ওই ছুই বস্তু তার আগে কোনোদিন কোনোখানে ছিল না। ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু বস্তুর উপযোগী নামে অভিহিত ছিল না। গত ছুই শতাব্দী ধরে শব্দছুটি মন্ত্রের মতো কাজ করে এসেছে। এমনও দেখা গেছে যে নামই আছে, বস্তুর অস্তিত্ব নেই! মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই সন্দেহ করেছেন যে সভ্য মানুষ আসলে বর্বর আর সংস্কৃতি তো কোল ভীল মুণ্ডাদেরও থাকতে পারে।

এখানে বলে রাখি যে 'সভ্যতা' শব্দটা 'সিভিলাইজেশনে'র ভাষান্তর। পারিভাষিক শব্দ হিসাবে সেটার প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রভৃতি ভাষায়। আর 'কালচারে'র পারিভাষিক শব্দ কী হবে সেটা আমাদের জীবদ্দশাতেই স্থির হয়, প্রথমে 'কৃষ্টি' ও পরে 'সংস্কৃতি'। কালচারের সঙ্গে কালটিভেশনের মিল আছে। মনের জমিন আবাদ করাকেই বলে কালচার। 'কৃষ্টি'ই কৃষির সঙ্গে মেলে। কিন্তু কথাটা কানে বাজে। রবীন্দ্রনাথ তো তা নিয়ে মশকরা করেন তাঁর 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে। তার

চেয়ে শ্রুতিমধুর 'সংস্কৃতি'। কিন্তু তার মধ্যে কর্ষণের ভাব কোথায় ? প্রাকৃতকে সংস্কার করলে সেটা হয় সংস্কৃত। প্রকৃতিকে সংস্কার করলে সেটা হয় সংস্কৃতি। এটা কিন্তু বিদেশী 'কালচার' কথাটির বক্তব্য নয়।

যাই হোক, চালিয়ে যখন দেওয়া হয়েছে 'কালচার' অর্থে 'সংস্কৃতি' তখন সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। কেউ কেউ এখনো কৃষ্টি নিয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে যেটা সবাই মেনে নেয় সেটাই চলিত হয়। কৃষ্টি একদিন অচলিত হয়ে যাবে। আক্ষরিক অর্থে কৃষ্টিই সত্যিকার পারিভাষিক শব্দ। সংস্কৃতি তা নয়। তা সত্ত্বেও সংস্কৃতি এখন দখলদার। স্বত্ববানের চেয়ে দখলদারেরই জোর বেশী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে কেবল শব্দদুটির উদ্‌ভাবন হয় না। তাদের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য নিয়ে বিদ্বানরা মোটামুটি একমত হন। আমরাও পরবর্তীকালে তাঁদের মতের সঙ্গে মত মিলিয়েছি। এখন ওইসব মত আন্তর্জাতিক বিদ্বৎ সমাজের সাধারণ মতে পরিণত হয়েছে। আর বিদ্বৎ সমাজও তো সেই সমাজ যে সমাজ আধুনিক ধরণের স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটি নির্ভর। এসব প্রতিষ্ঠান তুলে দাও, তারপর দেখবে কারো সঙ্গে কারো মত মিলছে না। 'কালচার' ও 'সিভিলাইজেশন' শব্দ দুটোরও নানা মুনি নানা অর্থ করবেন।

'স্কুল', 'কলেজ', 'ইউনিভার্সিটি' এই তিনটি শব্দও বহিরাগত।

এদের আমরা ভাষান্তরিত করে 'বিদ্যালয়', 'মহাবিদ্যালয়' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণ করেছি। তার ফলে আমাদের মনে ধারণা জন্মেছে যে এসব তো আমাদের দেশে চিরকাল ছিল। না, ছিল না। যা ছিল তার নাম পাঠশালা, টোল বা চতুষ্পাঠী। আরো আগে গুরুগৃহ বা গুরুকুল বা বৌদ্ধ বিহার। মুসলমানদের মধ্যে মক্তব, মাদ্রাসা, ইমামবাড়া। দেশে শিক্ষিত জনের অভাব ছিল না, উচ্চশিক্ষিত জনেরও অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে এই যে সীস্টেম এটা বহুদিন ধরে ইউরোপে বিবর্তিত হবার পর ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে। আরো পরে চীনে জাপানে। ইউরোপের মধ্যেও পশ্চিম ইউরোপ অগ্রণী, রাশিয়া অনুসরণকারী। বিপ্লবের পরে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কী কী পরিবর্তন করেছেন ঠিক বলতে পারব না, তবে তাঁরাও সীস্টেমটার মূলোচ্ছেদ করেননি। সেই কাজটি করতে চাইছেন চীনদেশের মহানায়ক মাও ৎসে-তুং। কতদূর সফল হয়েছেন ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে ষোল আনা সফল হওয়া সম্ভবপর। কারণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় চীনকেও অগ্রগামী হতে হবে। অগ্রগামী হতে হলে একই রাস্তায় এগোতে হবে। ভিন্ন পথে চললে তার নাম অগ্রগামিতা হবে না, হবে ভিন্নগামিতা। সে রকম অভিপ্রায় থাকলে কি চীন হাইড্রোজেন বোমা বানাত? হাইড্রোজেন বোমার পেছনে যে ফলিত বিজ্ঞান সে বিজ্ঞান যাঁহা মার্কিনে তাঁহা চীনে। বিজ্ঞানীদের সবাইকেই

স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির জাঁতাকলের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। যাঁরা ভিন্ন পথে চলবেন তাঁরা হাইড্রোজেন বোমা বানাতে পারবেন না, বানাবেন তীর ধনুক বা গাদা বন্দুক।

জাঁতাকল জিনিসটা আমার দু'চক্ষের বিষ। তাই আমি স্কুল জীবনে ছিলাম স্বভাব পলাতক। স্কুল থেকে বেরিয়ে পণ করি যে আর নয়। এখন থেকে আমি জীবনের কাছেই শিখব। জীবন আমাকে যা শেখাবে তাই শিখব। কলেজে ভর্তি হব না। বই মুখস্থ করব না। পরীক্ষার দুঃস্বপ্ন দেখব না। ডিগ্রীর জন্যে রক্ত জল করব না। কিন্তু সাংবাদিক হতে গিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার উৎসাহ একেবারে জল। কলেজে গিয়ে পেছনের সারিতে বসি। বন্ধুদের নিয়ে একটু আধটু সাহিত্য করি। অবাক হয়ে যাই একটার পর একটা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এর জন্যে আমাকে বড়ো কঠোর মাশুল দিতে হয়। মাশুলটা ইনটেলেকটের অতিকর্ষণ। এতে হৃদয়বৃত্তি, কল্পনাশক্তি, ইনটুইশন ও ঈশ্বরবিশ্বাস অবহেলিত বা উপেক্ষিত হয়। দেহচর্চারও সময় মেলে না। এক ভদ্রমহিলা আমাকে একটা অতি নিষ্ঠুর কথা শুনিয়ে দেন। "ইউ আর এ ব্যাগ অফ বোন্স।" আমি নাকি একটা হাড়ের বস্তা। তার চেয়েও নির্মম বাক্য এক বন্ধুর মুখে শুনি। "আপনার বিয়ে করা উচিত নয়। ছেলে-মেয়ে জন্মালে তারা হবে প্যাঁকাটির মতো।"

এদিকে আমি কিন্তু মনঃস্থির করে বসে আছি যে, কেউ

আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে না চাইলে আমি বিয়েই করব না। আমার চাকরিকে ভালোবাসা তো আমাকে ভালোবাসা নয়। আর চাকরিও কি আমি করতে চাই নাকি! করলেও সে আর কদ্দিন! জোর পাঁচ বছর। তা ছাড়া আমার আরো একটা পণ ছিল। সেটাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক। আমি যেদিন স্কুল থেকে বেরুই সেইদিনই ঠিক করি যে আমার যদি ছেলেমেয়ে হয় তাদের আমি স্কুলে পড়তে পাঠাব না। কোনো স্কুলেই না। স্কুলমাত্রেই আমার চক্ষুঃশূল। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'। ছেলেমেয়েরা বাড়ীতেই পড়বে। কিন্তু মনের আড়ালে একটা মোহ ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় তো তেমন নয়। আহা! কী প্রাকৃতিক পরিবেশ!

বিয়েও হলো, ছেলেও হলো। তার চেহারা দেখে এক ভদ্র-মহিলা আদর করে বললেন "গুণ্ডা"। এখন সেই বলিষ্ঠ বালককে আমরা স্কুলে পাঠালুম না। বাড়ীতেই পড়ালুম, কিন্তু ইংরেজীতে নয়। মাধ্যমহিসাবে তো নয়ই, ভাষাহিসাবেও ইংরেজী শিক্ষা নিষেধ। ওর মা ইংরেজীভাষিণী। তাঁকেই কিনা বাংলা শিখে নিতে হলো ছেলের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আমি যে আমার ছেলের সর্বনাশ করছি এ বিষয়ে ইংরেজ বাঙালী একমত। কিন্তু বাংলাভাষায় ওর বয়সের ছেলেদের জন্যে যতরকম বই ছিল সবই ওকে পড়তে দেওয়া হয়েছিল। আর মুখে মুখে বাংলায় তর্জমা করে ইংরেজীতে যতরকম বই ছিল সে সবও বুঝিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। ইংরেজী ভিন্ন আর সব বিষয়েই ও পাকা। এই ভাবে চলল ওর জীবনের প্রথম আটটি বছর। আমার তো ইচ্ছা ছিল আরো চার বছর চালাবার। বারো বছরের আগে ওকে আমি ইংরেজী শিখতে দিতুম না। আমার থিওরি ছিল মানুষ কেবল একটা ভাষাতেই চিন্তা করতে পারে, একাধিক ভাষায় নয়। গোড়া থেকেই একাধিক ভাষায় চিন্তা করলে চিন্তার শক্তি ক্ষয় হয়। আগে বাংলাভাষায় চিন্তা করতে করতে চিন্তা-শক্তিতে শক্তিমান হোক। তার পরে ইংরেজী শিখবে ও দ্রুত দক্ষ হবে।

ইতিমধ্যে আমার আরো দুটি সন্তান হয়েছে ও তাদের উপর দিয়েও একই এক্সপেরিমেন্ট চলেছে। বন্ধুরা একবাক্যে না-মন্‌জুর করেছেন এই শিক্ষাপদ্ধতি। আমার তো খেয়াল ছিল ওদের যদি কোথাও পাঠাতেই হয় তা হলে পাঠাতুম শ্রমিকদের বিদ্যালয়ে। মধ্যবিত্তদের বিদ্যালয়ে নয়। আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় সহযোগী আমাকে বলেন, "অমন কাজটি করবেন না। ওখানে গেলে ওরা নোংরা কথা শিখবে।" শ্রেণীশূন্য সমাজের জন্যে আমার যে কল্পনা ছিল সেটা তাঁর অগ্রাহ্য।

পুণ্যার যখন আট বছর বয়স তখন সে তার ছোটভাইকে হারায়। শোকে দুঃখে আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবি। ছুটি নিয়ে চলে যাই শান্তিনিকেতনে। সেখানে বসে বই লিখব। তাই দিয়ে যেমন করে হোক সংসার চালাব। সেই সময়ই স্থির

করি যে পুণ্যকে রবীন্দ্রনাথের পাঠভবনে ভর্তি করে দেব। নইলে ওই দামাল ছেলেকে বাড়ীতে সামলানো যাবে না। গুরুদেব তো খুব খুশি, কিন্তু আমাদের রেখে তিনি চলে যান কালিমপং। আর আমরা শুনি পুণ্যকে তার সমবয়সীদের ক্লাসে ভর্তি করতে পারা যাবে না। কারণ সে আর সব বিষয়ে পাকা হলেও ইংরেজী বিলকুল জানে না। ইংরেজীর ক্লাসে হাঁ করে বসে থাকবে। ওর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা কিছু করা যায় না? পাঠভবনের গুরু যাঁরা তাঁরা বলেন, "না। তা কী করে হয়! নিয়ম নেই যে!" পুণ্যকে সব চেয়ে নিচের ক্লাসেই ভর্তি হতে হবে। হোক না কেন দু'বছর নষ্ট। কৃষ্ণ কৃপালানী তখন পাঠভবনের অধ্যক্ষ। একদিন তিনি স্বয়ং এসে আমাকে বলেন, "আমি ওঁদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছি। আমি ওঁদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে, এই ছেলেটিকে নিয়ে আপনারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখুন ফল কী হয়, ইংরেজী কি কম সময়ের মধ্যে শিখে নেওয়া যায় না? ওঁরা কিছুতেই রাজী হন না। ওঁদের ওই এক কথা। নিয়ম!"

অর্থাৎ 'তাসের দেশ' আর কী! ওখানে প্রত্যেকটি ছেলেকে সব চেয়ে নিচের ক্লাস থেকেই ইংরেজী শেখানো হতো। গুরুদেবের থিওরি যাই হোক। থিওরিতে ও প্র্যাকটিসে গরমিল শান্তিনিকেতনেও দেখব প্রত্যাশা করিনি। আমার মোহভঙ্গ হয়। ওদিকে পুণ্যও আমাকে গুরুদেবের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সময় দেয় না। ফল পাড়বার জন্যে গাছে ঢিল ছোঁড়ে আর

সেই ঢিল পড়ে ওর নিজেরই মাথায়। কলকাতা নিয়ে গিয়ে অপারেশন করাতে হয়। তারপরে ওকে শান্তিনিকেতন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই কর্মস্থলে। চাকরিটা রাখি। বাড়ীতে ইংরেজী শেখাই।

বার্টরাণ্ড রাসেল স্কুলের পড়া বাড়ীতে বসেই শেষ করেন, তারপর সরাসরি কলেজে যান। কী এমন ক্ষতি হয়েছিল তাঁর? আমরাও সেই মহাজন পন্থায় আস্থাবান ছিলুম। কিন্তু তিনিই তো আবার তাঁর সন্তানদের জন্যে স্কুল স্থাপন করলেন। তা হলে কি আমরাও নতুন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করব? সে বাসনা আমাদের ছিল না। পুণ্যর সমবয়সীরা সবাই যাচ্ছে স্কুলে, সবাই ফুটবল ক্রিকেট খেলছে, ডিবেট করছে, অভিনয় করছে, আর সে বেচারা একেবারে কুণো। মেলামেশার সাথী নেই। ভবিষ্যতে যারা দেশের বিভিন্ন বিভাগের ভার পাবে তাদের কারো সঙ্গে তার চেনাশোনা হচ্ছে না। স্কুল কি কেবল বিদ্যাস্থান? ইটনের মাঠ তো ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্র। আজকের দিনের জীবনসংগ্রামে স্কুলই হচ্ছে উদ্যোগপর্ব। স্কুলে না পড়ে বাড়ীতে পড়েও মানুষ হওয়া যায়, কিন্তু পড়াশুনা ছাড়া আরো দশটা দিক আছে যার সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে স্কুলজীবনই প্রশস্ত। ধীরে ধীরে আমার মত বদলায়।

আদর্শ স্কুল যখন হাতের কাছে পাচ্ছিনে তখন যেটা পাচ্ছি সেটাই শ্রেয়। আমার নিজের শিক্ষাও তো আদর্শ বিদ্যালয়ে

হয়নি। এগারো বছর বয়সে পুণ্যকে ভর্তি করে নেন এক ইংরেজ মিশনারী তাঁর স্কুলে। আমিও বদলী হতে হতে চলি। সেও ট্র্যান্সফার হতে হতে চলে। শেষের দিকে ক্লাসে ফার্স্ট হয়। ইংরাজীতেও বোধ হয় তাই। কলেজেও ভালো করে। স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশে যায়। কাজেই আমাদের ঘরোয়া এক্সপেরিমেন্টটা ব্যর্থ হয়নি। আমরা ওকে বাঙালী করতে চেয়েছিলুম। ও বাঙালীই হয়েছে। সাহেব হয়নি। কিন্তু জার্মানভাষায় লিখেছে থীসিস ও ইংরেজীতে লিখেছে গ্রন্থ।

স্বাধীনতার পরে দেশে উলটো দিক থেকে হাওয়া বইতে থাকে। তার ফলে ওর ছেলেটি হয়েছে ইংরেজীতে পয়লা নম্বর আর হিন্দীতে দোসরা। কিন্তু বাংলায় একেবারে কাঁচা। যদিও বাংলাই হচ্ছে ওর মাতৃভাষা। একই ব্যাপার দেখা যাচ্ছে আমার অন্যান্য পুত্রকন্যার সন্তানদের বেলাও। ওরা নিজেরা যে সুযোগ আমার দোষে পায়নি সে সুযোগ দিচ্ছে ওদের ছেলেমেয়েদের। আমার এক্সপেরিমেন্ট কি কোথাও কেউ অনুসরণ করল ? মুখে যিনি যাই বলুন কার্যকালে সেই ইংরেজী। আর তার উপর হিন্দী। এ দুটো ভাষা ভালো করে না শিখলে চাকরির পরিধি সংকীর্ণ।

এখন সংস্কৃতির কথায় আসি। কেবলমাত্র সংস্কৃতির কথা ভেবে কেউ স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে জীবনের ষোল সতেরোটো বছর কাটাতে যায় না। এত খরচও করে না।

মানবজমিন আবাদ করলে সোনা ফলবে, এই বিশ্বাস থেকেই ষোল সতেরো বছর ধরে চাষ আবাদ। কালটিভেশন। কালচার। সোনা হয়তো সকলের বেলা ফলে না, তবু সংস্কৃতির সোহাগা তো উপজায়। সমাজকে সংস্কৃতিসম্পন্ন করার ওর চেয়ে উত্তম উপায় এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

প্রশ্ন উঠবে, কোন্ সমাজকে? উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজই কি সমগ্র সমাজ? কৃষক শ্রমিক কারিগরদের ঘরের ক'জনকে তোমরা ষোল সতেরো বছর ধরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারো? ওভাবে শতকরা ক'জনের মানব জমিন আবাদ হতে পারে? তাতে সোনা ফলতে পারে? সোনা যদি-বা না ফলে সোহাগা উপজাতে পারে? একশো বছর সময় পেলেও কি তোমরা দেশের সাধারণ মানুষকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে সংস্কৃতিমন্ত করতে পারবে? শ্রীমন্ত করা তো দূরের কথা। সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়নির্ভর করো তবে সে আশা দুরাশা। যদি বিশ্ববিদ্যালয়নিরপেক্ষ করো তা হলে আশা আছে। তা বলে শিক্ষানিরপেক্ষ করলে চলবে না। শিক্ষাই হচ্ছে মনের চাষ আবাদ। কালটিভেশন। কালচার।

বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের মাটিতে রোপণ করার সময় ওদেশের মতো এদেশেরও সুধীজনের ধারণা ছিল যে, উচ্চতর পদের জন্যে চাই উচ্চতর শিক্ষা। উচ্চতর শিক্ষা যারা পাবে তাদের জন্যেই উচ্চতর পদ। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাস

এই কথাই বলে যে, চার্চের তথা রাষ্ট্রের উচ্চতর পদগুলির জন্যে যোগ্যতা যাচাই করার নিরপেক্ষ উপায় হচ্ছে পরীক্ষা ও ডিগ্রী। পরীক্ষা ও ডিগ্রীর সরষের ভিতর ভূত থাকলে তো নিরপেক্ষতা থাকে না। সরষের থেকে ভূতকে দূরে রাখার খ্যাতি যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশবিদেশে সমাদর পেতো। বহুদূর থেকে বহু বিদ্যার্থী আসত তাদের আকর্ষণে। ফিরে গিয়ে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জোরে চাকরিও পেতো স্বদেশে। এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত হয় তখন পরীক্ষা ও ডিগ্রীর সরষের ভিতর ভূত থাকে না। তাই ডিগ্রীর জোরে এক প্রদেশের গ্রাজুয়েট অপর প্রদেশে চাকরি পায়। সম্মান পায়। তখনকার দিনের সেই ঐতিহ্য কি আর আছে? রাখতে কি আর পেরেছি আমরা? তাই উচ্চতর পদের জন্যে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনই অনেকে উড়িয়ে দিতে চান। তার জন্যে ডিগ্রী না হলেও নাকি চলে। উচ্চতর শিক্ষা যারা পাবে তারাই কেবল উচ্চতর পদের জন্যে যোগ্য বিবেচিত হবে, এ ধারণাও ক্রমে লোপ পেতে চলেছে। উচ্চতর পদ সকলের অনায়াসলভ্য হলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। শাসনের পক্ষেও মারাত্মক।

ইউরোপের মাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হলো কী করে আর কেন? রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর অধ্যয়ন অধ্যাপনার দায় দায়িত্ব রোমান ক্যাথলিক চার্চের উপরে অর্সায়। চার্চের কাছে

তার নিজস্ব বিদ্যার বাইরে আর যা-কিছু সবই পেগান। রোমান আইন বা চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখাতে হলে পেগানদের ডাকতে হয়। সবাইকে খ্রীস্টান করাই যাঁদের উপরে মহামান্য পোপের নির্দেশ তাঁরা পেগানদের সহ্য করতে পারেন না। নিজেরাও পেগান বিদ্যা শিখতে বা শেখাতে পারেন না। অথচ তার চাহিদা ছিল। যেমন লাটিনসাহিত্যের ক্লাসিকসের। গ্রীকসাহিত্যের ক্লাসিকসের। সংস্কৃতিকে কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্বে বা স্মৃতিশাস্ত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় ছেদ পড়ে যায়। সংস্কৃতির নায়ক শাস্ত্রী মহাশয়রা হতে পারেন না। তার জন্যে চাই কবি, নাট্যকার, গায়ক, বাদক, অভিনেতা, চিত্রকর। তার জন্যে চাই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্বিদ, স্থপতি, আইনজ্ঞ, চিকিৎসক। চার্চের কর্তারা না পারেন এঁদের স্থান পূরণ করতে, না পারেন এসব বিদ্যাকে নির্বাসিত করতে।

বেশ কয়েক শতাব্দীর অব্যবস্থার পর দেখা গেল গ্রীকভাষায় রচিত চিকিৎসাগ্রন্থ চেয়ে পাঠিয়েছেন বাগদাদের খলিফা। তাঁর আনুকূল্যে সেগুলিকে আরবীভাষায় তর্জমা করেন স্থানীয় সীরিয়ান খ্রীস্টান পণ্ডিতরা। আরবরা সেসব তর্জমা করা বই নিয়ে যায় ইউরোপে। সেখানে আরো এক দফা তর্জমা হয়—লাটিন ভাষায়। পড়ানোর জন্যে ডাক পড়ে ইহুদীদের। এমনি করে পত্তন হয় সালের্নোতে এক চিকিৎসা বিদ্যাপীঠ। পরে আইনের বিদ্যাপীঠ পত্তন হয় বোলোন্যায় ও প্যারিসে। পরে তার সঙ্গে

যুক্ত হয় লাটিন ভাষার ক্লাসিকস। বিদ্যাপীঠের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে। পড়ানো হয় অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, লজিক ইত্যাদি বিষয়। আরো পরে থিওলজির থেকে স্বতন্ত্র করে ফিলসফি। বলা বাহুল্য থিওলজি শিক্ষার ব্যবস্থা বরাবরই ছিল। চার্চের অধীনে চাকরি পেতে হলে থিওলজি তো পড়তে হতোই, তার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় বিধিবিধান। বিজ্ঞান আসে আরো পরে। আর তাই নিয়ে কত লোকের প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড হয়। তেমনি করে উচ্চশিক্ষিতদের মানসে সংঘটিত হয় এক অদৃশ্য ঘটনা। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ। মানবিকবাদে দীক্ষা। রেনেসাঁস।

বিদ্যাপীঠগুলিকে গোড়ার দিকে ইউনিভার্সিটি বলা হতো না। কথাটা আসে লাটিন ভাষার 'universitat' থেকে। তার মানে কর্পোরেশন বা কমিউনিটি। আমাদের যেমন কাশী মিথিলা নবদ্বীপে নানা প্রদেশ থেকে বিদ্যার্থীর সমাবেশ হতো তেমনি ওদের হতো বোলোন্যায়, পাদুয়ায়, প্যারিসে। স্বদেশী বিদ্যার্থীদের চেয়ে বিদেশী বিদ্যার্থীদের সংখ্যা বহুগুণ। স্থানাভাব হতো, বাড়ীওয়ালারা চড়া হারে ভাড়া দাবী করত, এমন কোনো প্রথা ছিল না যে গুরুই শিষ্যকে আশ্রয় দেবেন। তাই ওরা দায়ে ঠেকে সংগঠন করে। সংগঠনের নাম উনিভারসিটাট। অর্থাৎ ছাত্র-পরিষদ্। বিদেশ থেকে অধ্যাপকরাও আসতেন। তাঁরাও তেমনি সংগঠিত হতেন। বহু স্থলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একই

সংগঠন। আবার এমনও দেখা যেত যে একই বিদ্যাপীঠে তিন চারটি উনিভারসিটাট। একটা হয়তো ফরাসীদের, আর একটা হয়তো জার্মানদের, আরও একটা হয়তো ইংরেজদের, আরও একটা হয়তো প্রোভাঁস অঞ্চল বাসীদের। প্রোভাঁস তখন ফ্রান্সের অঙ্গ নয়। যতগুলো 'নেশন' ততগুলো উনিভারসিটাট। পরে ওই একই শব্দের অর্থান্তর ঘটে। গোটা বিদ্যাপীঠটাকেই বলা হয় ইউনিভার্সিটি।

ওদিকে দেশী বিদেশী শিক্ষক মহাশয়রা একজোট হয়ে পত্তন করেন 'Collegia' নামক সংস্থা। উদ্দেশ্য ডিগ্রী দান। তথা আশ্রয় দান। দরিদ্রছাত্ররা থাকবে সেখানে। সেখানে থেকে পড়াশুনা করবে। তাদের ব্যয়বহনের জন্যে এনডাউমেণ্ট সংগ্রহ করা হয়। তার থেকে এলো কলেজ। কলেজমাত্রেই আদিতে ছিল আবাসিক। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে এখনো তাই। আবাসিকরা এখন প্রচুর দক্ষিণা দেয়। সাধারণত বড়লোকের ছেলে। ইদানীং সরকারী ছাত্রবৃত্তি নিয়ে গরিবের ছেলেরাও আবাসিক হচ্ছে। অনাবাসিক কলেজের সূত্রপাত ইংরেজদের দেশে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর লণ্ডনে। তারই অনুকরণে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে। সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত হয় ডিগ্রীদানের। ডিগ্রী দান যখন ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত হয় তখন তার হেতু ছিল এই যে শিক্ষা সমাপ্ত করে যারা কাজকর্মের সন্ধানে বেরবে তখন তাদের আর নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে

না। ডিগ্রী দেখালেই চার্চ বা রাষ্ট্র বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করবে যে প্রার্থীরা যথারীতি পরীক্ষা দিয়েছে ও পাশ করেছে। ডিগ্রীর গুরুত্ব যখন এত বেশী তখন ডিগ্রীদানের অধিকার প্রত্যেকটি বিদ্যাপীঠ দাবী করতে পারত না। সেইসব বিদ্যাপীঠকেই পোপ কিংবা সম্রাট কিংবা রাজা সেই অধিকার দিতেন যেসব বিদ্যাপীঠ তাঁদের বিচারে উৎকৃষ্ট। তবে অক্‌সফোর্ডের মতো অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি বিদ্যাপীঠকে যাজকীয় বা রাজকীয় আদেশপত্র নিতে হয়নি।

এককথায় বলা যেতে পারে যে সেইসব বিদ্যাপীঠই ইউনিভার্সিটি পদবাচ্য যাদের ডিগ্রী দেখাতে পারলে আর নতুন করে পরীক্ষা দিতে হয় না। সেই ডিগ্রীর জোরেই কর্মপ্রাপ্তি সুগম হয়। যদি কর্ম আদৌ খালি থাকে। সেকালেও কর্মের অভাব ছিল যথেষ্ট। চার্চের বা রাষ্ট্রের ঘরে কর্মাভাব, তাই বড়লোকদের ঘরে প্রাইভেট টিউটর হতেন অনেকে। কেউ কেউ হতেন প্রাইভেট সেক্রেটারি। বাণিজ্য আর সাম্রাজ্য মিলে ইউরোপকে চার শতাব্দী পূর্বে অপ্রত্যাশিত একটা স্টার্ট দেয়। দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে যায়, অধ্যাপনার বিষয়ও যায় বেড়ে। কাজকর্মও জুটে যায় ডিগ্রীধারী বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীর। দেশে না হোক বিদেশে। ডিভিনিটির ডিগ্রী নিয়ে বা না নিয়ে খ্রীষ্টীয় প্রচারকরাও আসেন। সরকারের অনুমতি নিয়ে বা না নিয়ে স্কুল কলেজ স্থাপন করেন প্রধানত তাঁরাই।

তবে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বেলা সরকারই হন অগ্রণী। অতঃপর ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার কাজে হাত দেন বেনারসে মদন-মোহন মালবীয়, আলীগড়ে স্যর সৈয়দ আহমদ খানের অনুসারকগণ, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ, পুনায় ধোন্দো কেশব কার্বে। বেনারস ও আলীগড় ডিগ্রী দেয় সরকারের আইনের বলে। বিশ্বভারতী তা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে পারে না, পরে ভারত সরকারের আইনের জোরে পারে। কার্বের প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সরকারের দ্বারা স্বীকৃত কিনা আমার অজ্ঞাত। মোটের উপর ভারতের সব ক'টা বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা নিয়ন্ত্রিত ও তাদের দেওয়া ডিগ্রী সরকারের দ্বারা স্বীকৃত। যতদূর জানি শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় কলেজ ডেনমার্কের রাজার আদেশপত্রের জের টেনে এখনো দিয়ে আসছে তার থিওলজির ছাত্রদের ডিভিনিটির ডিগ্রী। ওরা সরকারী চাকরি চায় না, ওদের কাজকর্ম জোগায় বিভিন্ন মিশনারী প্রতিষ্ঠান।

টোল চতুষ্পাঠী মক্তব মাদ্রাসার ঐতিহ্য ইউরোপীয় ঐতিহ্য নয়। ইউরোপীয় ঐতিহ্য যারাই মেনে নিয়েছে তারাই ইউনিভার্সিটির কাছে প্রত্যাশা করে ডিগ্রী আর তাদেরও কাছে ইউনিভার্সিটি প্রত্যাশা করে পরীক্ষা। ওটা যেন অলিখিত একটা চুক্তি। শিক্ষার্থীরা দেবে পরীক্ষা, শিক্ষাগুরুরা দেবেন ডিগ্রী। পরীক্ষা যদি ফাঁকি হয় ডিগ্রীও হবে ফাঁপা। অমন ডিগ্রী দেখে কেউ চাকরি দেবে না। বলবে, আবার পরীক্ষা দাও। অথচ

ডিগ্রীর সৃষ্টিই হয়েছিল দ্বিতীয়বার পরীক্ষা এড়াতে। পরীক্ষাই যদি আবার দিতে হলো তবে ডিগ্রীর কী প্রয়োজন? প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কথা আলাদা, সেক্ষেত্রে পদের সংখ্যা পরিমিত, প্রার্থীর সংখ্যা অপরিমিত।

ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাশ করা ও ডিগ্রী পাওয়া আজকাল হামেশা ঘটছে। কিন্তু তার বিপরীতটাও সত্য। একজন অতি মেধাবী ছাত্র অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে বা অন্য কোনো কারণে পরীক্ষায় ফেল করে বা খারাপ করে। বেচারার কেরিয়ারটাই নষ্ট। তা বলে তো সে বিদ্যার দিক থেকে কাঁচা নয়। সংস্কৃতির দিক থেকেও খাটো নয়। মনের জমিনের যে চাষ আবাদটা সে করেছে সেটার ফসল থেকে কি কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে? কালচার হচ্ছে নিজেই নিজের পুরস্কার। এই কথাটিই সারকথা যে, অধ্যয়নটাই আসল, ডিগ্রীটা তার সুদ। আসলটা হারায় না, সুদটা হয়তো হারায়।

কতকটা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, কতকটা রাজনীতির প্রয়োজনে উচ্চপদের সংখ্যা এখন ইংরেজ আমলের চাইতে অনেক বেশী। তার সঙ্গে তাল রেখে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনও সমান বেশী। বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমাদের সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেবে একথা আর ভাবাই যায় না। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন যে সমাজবিপ্লবের পরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ও বিলুপ্ত হবে।

তেমন দিন যদি কখনো আসে তখনো দেখা যাবে যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ও আবার ঘুরে ফিরে আসবে। কারণ উচ্চপদও আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে। কতকটা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কতকটা রাজনীতির প্রয়োজনে। এই নিয়েই তো চীনদেশে এমন তীব্র মতভেদ। এর নাম রেখেছে ওরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সত্যি কি তাই?

ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীটাকে উৎসন্ন করতে পারো, জমিদার শ্রেণীটাকে উচ্ছেদ করতে পারো, কিন্তু তোমাদের কলকারখানা ব্যাঙ্ক ট্রেজারি চাষের জমি বাসের জমি ও জাতীয় সম্পত্তি ম্যানেজ করবে কারা? তার জন্যে যে চাই একটি ম্যানেজার শ্রেণী। সেইজন্যে রুশবিপ্লবকে বলা হয়ে থাকে ম্যানেজারিয়াল রেভোলিউশন। এই যে নতুন ম্যানেজার শ্রেণী এর খাঁই বড়ো কম নয়। যাতে এরা লোভে পড়ে অসৎ না হয় তার জন্যে এদের মজুরি সাধারণ মজুরের তুলনায় বহুগুণ। তা ছাড়া এদের কর্মদক্ষতারও মূল্য আছে। একজন জেট বিমান চালক তো একজন বাসচালকের চেয়ে বেশী ঝুঁকি দেয়, বেশী সাহস দেখায়, বেশী কৌশলী হয়। মুড়ি মিছরির একদর হলে জেট বিমান চালাতে কেই বা রাজী হবে? গায়ের জোরে রাজী করানো কি সর্বক্ষেত্রে সম্ভব? এমনি করে উৎপত্তি হয় নতুন একটা উচ্চতর শ্রেণীর। তখন তার বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা আবশ্যক হয়। তার উত্তরে যদি প্রতিবিপ্লব ঘটে, তখন?

সমাজতন্ত্রের দুর্ভাগ্য হচ্ছে বুরোক্রাসীর সর্বব্যাপী প্রসার। কিন্তু বুরোক্রাটদের মধ্যেও গুণকর্ম বিভাগ অনুসারে বিপ্লববৈষম্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করাই কি এর সমাধান ?

উচ্চতর শিক্ষা, উচ্চতর সংস্কৃতি, উচ্চতর পদ, উচ্চতর বিত্ত, উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা, উচ্চতর আর্থিক ক্ষমতা, উচ্চতর রাজনৈতিক প্রভাব ও উচ্চতর জীবনদর্শন আদিকাল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পরনির্ভর। যখনি এদের একটিকে ছিন্ন করা হয় তখনি আর একটির অঙ্গে লাগে। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে নির্বিকার থাকা যায় না। সেটা যেদিক থেকেই আসুক না কেন ফলভোগ করতে হবে সাহিত্যকেও। যা নিয়ে আমি আছি। শিক্ষা নিয়ে আমার কথা বলার অধিকার এই সূত্রে। নতুবা আমি শিক্ষকও নই, শিক্ষার্থীও নই, শিক্ষা অধিকর্তাও নই, বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ বা পরিষদের সদস্যও নই। মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ে, তাই দু'এক কথা বলতে হয়।

সমাজের ন্যায়সম্মত পুনর্বিন্যাস নিয়ে যাঁরা চিন্তাকুল আমিও তাদের একজন। যারা নিচে পড়ে আছে তাদের উপরে তুলতেই হবে। যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের সামনে টেনে আনতেই হবে। যারা ক্রীতদাস না হলেও মজুরি দাস তাদের মুক্তি দিতেই হবে। স্লেভারি রহিত হয়েছে, ওয়েজ স্লেভারি আরো বেড়ে গেছে। একালের মানুষ একহিসাবে সেকালের মানুষের চাইতেও অধম, কেননা এরা যুদ্ধকালে কন্‌স্ক্রিপ্ট হয়। শান্তিকালেও রেহাই

পায় না। এটা ক্যাপিটালিস্ট তথা কমিউনিস্ট উভয় সমাজেই সমান সত্য। এ প্রথা রহিত না হলে লিবার্টির অভিমান বৃথা। আর ইকোয়ালিটি বলতে যারা অজ্ঞান তাদের সমাজে পার্টি মেম্বর ও পার্টি মেম্বর নয় এই দুই ভাগে বিভক্ত নাগরিক কি সমদৃষ্টির অধিকারী ; ক্লার্জি এখন পার্টি সেজে ফিরে এসেছে।

শিক্ষাঘটিত ব্যাপারে আমার বিচার জাতীয়তাবাদীর মতো নয়। দেশ নয়, যুগই আমার বিবেচনায় মুখ্য। এ যুগের মুখ্য স্রোতটা পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই জন্যে আমার তরুণ বয়সের ধ্যান ছিল যেমন করে হোক একবার পশ্চিমের মুখ্য স্রোতে অবগাহন করে আসতে হবে। একই ধ্যান আজকের দিনের তরুণবয়সীদেরও। প্রথম সুযোগেই তারা পশ্চিমযাত্রা করে। তাদের আটক করার জন্যে কি কম চেষ্টা হয়? সমুদ্র-যাত্রা সেকালে সোজাসুজি নিষিদ্ধ ছিল। একালে প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ। এসব না করে আমাদের নেতারা মুখ্য স্রোতটাকে আবার প্রাচ্যদেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে উদ্যোগী হন। যেমনটি ছিল মৌর্য ও গুপ্ত যুগে। রিভাইভাল আর সম্ভব নয়, কিন্তু রেনেসাঁস সম্ভব। এর খানিকটে হয়ে রয়েছে বহিরাগত শিক্ষা-ব্যবস্থার কল্যাণে। কিন্তু এমন ঘূণ ধরেছে এতে যে এর মূলোচ্ছেদ না করে আমূল সংস্কার প্রয়োজন। রিয়ালিটির সঙ্গে নতুন করে মন মিলিয়ে নিতে হবে। আর চোখ কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়।

এবার বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে স্থির করি যে অন্যান্যদের দিয়ে লেখাব, নিজে কিছু লিখব না। লিখলে আমার যা স্বভাব সাহিত্যের ধান ভানতে রাজনীতির শিবের গীত গাইব। তাতে ভুল বোঝাবুঝি কমবে না বাড়বে কে বলতে পারে! আমি আর যাই করি ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে দেব না। তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়।

কিন্তু যে আনন্দ এবার আমি পেয়েছি তা কি তা বলে অব্যক্ত থেকে যাবে? না, আমাকে বলতেই হবে। ঈশ্বরের কাছে আমি দীর্ঘজীবন চাইনি। এটা তাঁর অযাচিত দান। কে জানে কী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল! হতেও পারে তিনি আমাকে শেখাতে চেয়েছিলেন যে মানুষের সব চেষ্টা বৃথা যায় না, আজ যেটা ব্যর্থ সেটা আপাতত ব্যর্থ, পরে সেটা সফল হবে, যদি সত্য হয়ে থাকে। আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, তা বলে হাহুতাশ করে আকাশকুসুম চয়ন করব কেন? বীজ থেকে গাছ জন্মাবে, গাছে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে। আমাকে দিয়ে নয়। তাতে কী আসে যায়! আমি নিমিত্তমাত্র।

টলস্টয়ের প্রভাবে পড়ে আমার আদর্শ ছিল আত্মসম্মান-

সম্পন্ন শিক্ষিত কৃষক। যাকে কেউ শোষণ করতে সাহস পাবে না। শাসক যাঁরা তাঁরাও সমীহ করবেন। তাই আমার হাতে যখন পরিচালনা এল তখন আমি রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার গাঁজামহালের হাইস্কুলকে করতে গেলুম সাধারণ হাই-স্কুলের থেকে ভিন্ন প্রকার। জুড়ে দিলুম তার উপরের দিকে চাষের ক্লাস। ছাত্ররা পড়াশুনাও করবে, চাষবাসও করবে। চাষবাসের শিক্ষা দেবেন কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত একজন ডেমনস্ট্রেটর। স্কুলের অবস্থান শহর থেকে দূরে। চারদিকে গ্রাম। ছাত্ররা কৃষকের ছেলে। সকলেরই ক্ষেতখামার আছে। আধুনিক পদ্ধতিতে আবাদ করলে অনায়াসেই ভালো ফসল পাবে। চাকরি করতে যাবে কেন? চাকরির উপর থেকে চাপ কমবে। শহরের উপর চাপ পড়বে কম।

কালচার অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকালচার। এই ছিল আমার মটো। আমি নিজেও একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাই নিয়ে থাকব। টলস্টয়ের অনুসরণে। কী দরকার কারো দাসত্ব করার! আমি যত বড়োই হই না কেন চাকুরে বলেই গণ্য হব। সার্ভিস মেণ্টালিটি স্লেভ মেণ্টালিটিরই ভদ্র নাম। স্বরাজ মানে কি আরো বেশী চাকরি? আরো বড়ো বড়ো চাকরি? না, স্বরাজ মানে আত্মসম্মানসম্পন্ন কৃষক ও শিল্পী।

কিন্তু দেখা গেল যাদের জন্যে স্কুল তারা অর্থাৎ গাঁজামহালের চাষী মুসলমানরা তাদের ছেলেদের চাষী করবে না, চাকুরে

করবে। স্কুলের কৃষি ক্লাসে একটির বেশী ছাত্র নেই। সেটিও বামুনের ছেলে। পাশ করে চাষ করবে না, পড়াশুনায় কাঁচা বলে তার অভিভাবক তাকে কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছেন। সে পাশ করে বেরোলে ডেমনস্ট্রেটর হবে। এই একটি ছাত্রের জন্যে এত বড়ো আয়োজন! আমি দমে যাই। ওদিকে একদল লোক উঠে পড়ে লেগেছিলেন স্কুলটাকে উঠিয়ে দিতে। আমার বদলীর পর সেটা বোধহয় দু'বছর বাদে উঠে যায়। আমার উৎসাহ চলে যায়।

ঢাকায় অধ্যাপক শহীদুল্লাহ্ ছিলেন আমার প্যারিসের আলাপী। আবার নতুন করে আলাপ জমে ওঠে। আমার দুঃখের কাহিনী শুনে তিনি যা বলেন তার মর্ম চাষীর ছেলেরা তো বাপের সঙ্গে মাঠে গিয়েই চাষ শেখে। স্কুলে গিয়ে আর নতুন কী শিখবে! জমির উপরে চাপ খুব বেশী। চাষীর সব ক'টি ছেলের জন্যে এত জমিই বা কোথায়! সেইজন্যে চাষী তার ছেলেদের অন্তত একজনকে পাঠায় স্কুলে পড়াশুনা করতে। পাশ করে চাকরি নিয়ে শহরে যেতে।

তার মানে গ্রামের উপর চাপ কমবে। শহরে ভিড় বাড়বে। সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তা। বোঝা গেল কেউ চাষ করবে না। না হিন্দুর ছেলে, না মুসলমানের ছেলে। সবাই করবে চাকরি। তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। মারামারি। ভাগাভাগি। তখনো মালুম হয়নি যে ভাগাভাগি করতে করতে ঘটবে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ।

এই ভেবে আমার দুঃখ হয় যে চাষীরা শিক্ষিত হলে চাষ করবে না, চাকরি করবে। আর অশিক্ষিত থাকলে শোষকদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না, বাবুদের কাছে সম্মান পাবে না। পশ্চাদপৎ থেকে যাবে। আমি ও প্রসঙ্গ ভুলে যাই। অন্য কাজে মন দিই।

বদলী হতে হতে একদিন যাই নদীয়া জেলায়। ভ্রমণসঙ্গী হই স্যর নাজিমউদ্দীনের। তিনি তখন স্যর জন অ্যাণ্ডারসনের এক্জিকিউটিভ কাউনসিলার। ডিনার টেবলে বসে আমাকে চমকে দিয়ে বলেন, "আপনি শুনে সুখী হবেন যে গভর্ণমেণ্ট এতকাল পরে আপনার পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছেন। সেই যে গাঁজামহালের স্কুল।" ততদিনে আমার মন ভেঙে গেছে। গাঁজামহাল কোথায় আর আমি কোথায়! পরে আবার রাজশাহী জেলায় বদলী হই। কিন্তু আর বেলতলায় যাইনে।

দেশ প্রস্তুত ছিল না। কাল উপযোগী ছিল না। পাত্র বলতে যদি আমাকেই বোঝায় তো আমি সাতঘাটে বদলী হতে হতে বদলে যাই। অসময়ে চাকরিও ছেড়ে দিই।

নওগাঁর পর কতকাল কেটে গেছে। এক প্রদেশ দুই প্রদেশ হয়েছে। এক দেশ দুই দেশ হয়েছে। পরে আবার তিন দেশ। যোগাযোগ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সাহিত্যের খোঁজখবর কতকটা রাখি। শিক্ষার খোঁজখবর রাখিনে। তবে মুক্তিযুদ্ধের পর বার বার তিনবার বাংলাদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে শিক্ষার সমাচারও একটু

আধটু পাই। সুযোগ পেলে মুখ ফুটেও দুটি একটি কথা বলি। গতবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা জমি তেপান্তরের মাঠের মতো ধূ ধূ করছে দেখে বলি, এখানে চাষ করা উচিত। ছেলেরাই করবে চাষ। কে কার কথা শোনে! সবাই চায় শহুরে শিক্ষা।

এবার সাভারের শহীদ মিনার দর্শন করে ওই পথ দিয়েই ফিরছি। সহযাত্রী এক ভদ্রলোক বলেন বাংলাদেশে এখন অগণিত কলেজ, কোনটারই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়, সরকার থেকে যা পাওয়া যায় তা মুষ্টিভিক্ষা। তাই কলেজের সংখ্যা কমিয়ে দেবার প্রস্তাব উঠেছে। সেইসব কলেজই সাহায্য পাবে যাদের নিজেদের আয় আশাপ্রদ। তিনি যে কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত তার কর্মকর্তারা আশে পাশের সব জমি কিনে নিয়েছেন। সেখানে চাষ হবে। লাভের টাকা হবে কলেজের প্রধান আয়। সরকারী সাহায্য না মিললেও কলেজ দাঁড়িয়ে থাকবে নিজের পায়ে।

দিন দুই বাদে শিক্ষাসচিব আমাদের ডিনার দেন। কথা-প্রসঙ্গে বলেন, সরকার স্থির করেছেন এখন থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হাইস্কুলেই কৃষি হবে একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়।

আমি চমৎকৃত হই। বলি, "আচ্ছা, আপনি কি জানেন এর প্রবর্তক কে?"

তাঁর জানার কথা নয়, কারণ আমি যখন নওগাঁয় তখন তিনি নবজাতক।

তিনি আমাকে সেদিন যে আনন্দ দেন তার তুলনা নেই। বলেন, "আপনিই। আপনার স্কীমের কাগজপত্র আমি দেখেছি।" ডিনারের পর ভাষণ দিতে গিয়ে আমি প্রাণভরে ধন্যবাদ জানাই তাঁকে, তাঁর সরকারের শিক্ষাবিভাগকে। কালচার আর অ্যাগ্রিকালচার ছিল আমার লক্ষ্য। এখন তাঁদেরও। আমার হাতে ক্ষমতা নেই, তাঁদের হাতে আছে। আমি বিশ্বাস করি তাঁরা সফল হবেন। যদি নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকেন। দেশকালপাত্র ভুলে গিয়ে আবেগের সঙ্গে বলি "আমি কৃতার্থ। আমার জীবন ধন্য।"

বাংলা সাহিত্য একাডেমী প্রসঙ্গে

প্রায় বিশ বছর আগে যখন দিল্লীতে সাহিত্য আকাদেমী. ললিতকলা 'আকাদেমী' ও সঙ্গীত নাটক আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রশ্ন উঠেছিল, 'আকাদেমি' ছাড়া আর কোনো শব্দ কি খুঁজে পাওয়া গেল না ? ওটা তো একটা গ্রীক শব্দ। ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় গৃহীত হয়েছে। সুতরাং ইউরোপীয় শব্দও বলা যেতে পারে। মৌলানা আজাদ এর উত্তরে কী বলেছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না, যতদূর মনে আছে আকাদেমি শব্দটা আরবদেশের সুধীসমাজও আপনার করে নিয়েছেন। এ-দেশেও মুসলিম বিদ্বানদের শিবলী আকাদেমির নাম শোনা যায়।

তা ছাড়া গ্রীক শব্দ কি সংস্কৃত ভাষায় কম আছে নাকি ? 'কেন্দ্র' কথাটাও তো গোড়ায় গ্রীক। 'কেন্দ্রীয় সরকার' যদি 'বেতার কেন্দ্র' পরিচালনা করতে পারেন তবে 'সাহিত্য আকাদেমি' এমন কী অপরাধ করল ! ওর ইংরেজী নাম হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাকডেমী অফ লেটার্স। ওর প্রতিষ্ঠাতারা কী জানি কেন আমাকেও তাঁদের একজন করেছিলেন। চোদ্দজনের কর্মসমিতিতে আমারও আসন ছিল জবাহরলাল নেহরু, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আবুল কালাম আজাদ, কে. এম পানিক্কর প্রভৃতির

সঙ্গে। প্লেটো কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলেন যে এমন এক আজব একাডেমী হবে যার ভাষার সংখ্যাই সদস্যদের সমান? এক একজন এক এক ভাষায় কথা বলবেন? কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারবেন না? মৌলানা আজাদ তো ইংরেজীতে বাতচিৎ করবেন না। সবাই যদি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন তা হলে ওটি হতো আর একটি 'টাওয়ার অফ্ বেবল'। যদিও ইংরেজী তার অন্যতম স্বীকৃত ভাষা ছিল না তবু ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির সাধারণ ভাষা হয় ইংরেজী।

বছর কয়েক বাদে বুঝতে পারা গেল ওটা ফরাসী আকাদেমির মতো আকাদেমি নয়। কোনোদিন হবেও না। হতে পারত, যদি ওর ভাষা হতো যে-কোনো একটি ভারতীয় ভাষা। কিন্তু একসূত্রে একরাশ ভাষাকে গাঁথতে গিয়ে কোনোটির উপরেই মনোনিবেশ করতে পারা সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে আকাদেমির স্বীকৃত ভাষার সংখ্যাও বেড়েছে। "যত মত তত পথ" এই যদি হয় নীতি তবে যতগুলি ভাষা ততগুলি আকাদেমি ছাড়া আর কোনো গতি নেই। তিন মাসে একবার একঘণ্টার জন্যে মীটিং করে বিশেষ বিশেষ ভাষার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না। বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি বিভিন্ন, বিকাশ বিভিন্ন, আদর্শ বিভিন্ন, মান বিভিন্ন। কয়েকটি ভাষার সাহিত্য এখনো ঊনবিংশ শতাব্দীতেই পা দেয়নি, কয়েকটি ভাষার সাহিত্য এখনো সেই শতাব্দীর থেকে পা সরিয়ে নেয়নি।

সংস্কৃত সাহিত্যে যে কোন্ যুগে আছে তা পণ্ডিতরাই জানেন। একই তৎসম শব্দের এক এক অঞ্চলে এক এক অর্থ। একদিন জবাহরলালজী 'কল্যাণ' শব্দটির উদাহরণ দেন।

একটু একটু করে আমার উপলব্ধি হয় যে গোটা কয়েক সাধারণ কর্তব্য ছাড়া আর কিছুই একসঙ্গে বসে করতে পারেন না তামিল, তেলুগু, মালায়লাম, কন্নড, গুজরাটী, মরাঠী, হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, সংস্কৃত ভাষার প্রতিনিধিগণ। এখন তো তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, মৈথিলী, সিন্ধি, ডোগরী ও ইংরেজী ভাষার প্রতিনিধিরা। মণিপুরী ও রাজস্থানীও স্বীকৃতি পেয়েছে। ভোজপুরী, কোঙ্কনী ও নেপালীও চাইছে। ইতিমধ্যে পেয়েছে।

তখন থেকেই আমি বলতে আরম্ভ করি যে বিভিন্ন ভাষার জন্যে বিভিন্ন শাখা আকাদেমি চাই। ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির শাখা। কথাটা কর্তাদের মনঃপুত হয় না। তাঁদের আশঙ্কা অমন করলে ভারত ভেঙে যাবে। ভারতীয় সাহিত্য আকাডেমি থেকে আমার বিদায়ের পর বিভিন্ন রাজ্যে সাহিত্য আকাডেমির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির শাখা রূপে নয়। স্বতন্ত্রভাবে। এসব রাজ্য আকাদেমি রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীন। পশ্চিমবঙ্গে সেরকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। থাকলে ভাল হোত ভেবে কথাটা আমি একটি সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের কর্ণগোচর করেছিলুম। পরে

খবরের কাগজে সেই প্রস্তাবের সমালোচনা দেখি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থাকতে আবার এক বাংলা সাহিত্য আকাদেমি কেন ?

বছর পাঁচেক পরে আবার বাংলা সাহিত্য আকাদেমির কথা উঠেছে। এবার যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের সামনে রয়েছে ঢাকার বাংলা একাডেমীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাত্র কয়েক বছরের কর্মিষ্ঠতায় ঢাকার বাংলা একাডেমী অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তাই সকলে ভাবছেন তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান এপারে থাকলে কত বেশী কাজ হোতো। আমাকেও সভায় আমন্ত্রণ করা হয়। ঘরে ঢুকছি এমন সময় এক বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি। তিনি বললেন, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে বাঁচান।" মিনতিভরা সেই আবেদন আমাকে অভিভূত করে। বাংলা সাহিত্য একাডেমী হলে যদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ উঠে যায় তবে সেটা হবে পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। অপর পক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ যদি ঢাকার বাংলা একাডেমীর মতো সক্রিয় না হয়, যদি তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে না পারে, যদি ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়, যদি প্রতিবেশী রাজ্যের সাহিত্য একাডেমীর সঙ্গে সংশ্রব না রাখে তবে তার একার বেঁচে থাকা হবে আর-একটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাঁচবার সুযোগ না দেওয়া।

বাংলা সাহিত্য আকাদেমি একদিন না একদিন ভূমিষ্ঠ

হবেই। কারণ যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ঢাকার বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে সেই ঐতিহাসিক অনিবার্যতাই কলকাতার বাংলা সাহিত্য একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ঘটাবে। ওপারে যাঁরা আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করছেন তাঁদের কাজ অপরিপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। তার পরিপূরক কাজ করতে হবে এপারেও। কিন্তু করবে কে? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্? ছড়া ছড়িয়ে রয়েছে মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে। কিন্তু একই ছড়ার জেলা অনুসারে এক এক পাঠান্তর। তুলনা-মূলক আলোচনা কেমন করে সম্ভব যদি ওপারের সংগ্রাহকরা যে আনুকূল্য ওপারে পাচ্ছেন এপারের সংগ্রাহকরা সেইরূপ আনুকূল্য এপারে না পান? একই বাউলগীতি আমরা দু' পারের বিভিন্ন জেলায় শুনেছি, কিন্তু মিল যত অমিলও তত লক্ষ্য করেছি। তুলনামূলক আলোচনার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে যখন দুই পারেই সংগ্রহের কাজ এগিয়ে যাবে। তার জন্যে চাই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও কর্মপ্রচেষ্টা।

ঢাকার বাংলা একাডেমী এক পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আর একটা পা অচল। সে যদি স্বেচ্ছায় সচল হতো তা হলে বাংলা সাহিত্য আকাদেমি নামক নতুন একটা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক হতো না। আমরা বহুদিন থেকে অনুভব করছি যে এটার জন্যে কাজ পড়ে রয়েছে, কাজ আটকে রয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ যদি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় তো

পুরাতত্ব নিয়েই থাকুক। পুবাতত্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্য একাডেমী তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে না। একাডেমীর কাজ বর্তমানকে নিয়ে। আঞ্চলিক শব্দ, ছড়া, প্রবাদ, লোকগীতি যদি এখনি সংগৃহীত না হয় তবে অচলিত হয়ে যাবে, বিকৃত হয়ে যাবে। পূর্ববঙ্গের একজন লেখক আক্ষেপ করেছেন যে গ্রামের চেহারাই বদলে যাচ্ছে, গ্রাম হয়ে উঠছে শহর, লোকে ভুলে যাচ্ছে এতদিন যা লোকের মুখে মুখে ছিল। যে প্রতিষ্ঠান কর্মতৎপর হবে তাকেই তো পথ ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশ এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাৎপদ। বাংলা একাডেমী যদি ঢাকায় প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে তার পরিপূরক একাডেমী কলকাতায়ও প্রয়োজন। তা বলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নিষ্প্রয়োজনীয় নয়। সেও থাকবে।

বাংলা সাহিত্য একাডেমীর প্রধান কাজ হবে ওপারের বাংলা একাডেমীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মান ও আদর্শ নির্ধারণ করা। এর জন্যে মাঝে মাঝে সেমিনার ডাকতে হবে, বৈঠকও বসাতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিভাগ যাতে বিকশিত হয় তার জন্যে উদ্যোগী হতে হবে। কেবলমাত্র কথাসাহিত্য দিয়েই সাহিত্যের পরিমাপ হয় না। আমাদের দর্শন বিজ্ঞান এখনো অপরিপুষ্ট। কেবল কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ তৈরী করে

দিলেই দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থ আপনি লেখা হয়ে যাবে না। লেখকও তৈরি করতে হবে। পাঠকও তৈরি করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার থেকে ইতিমধ্যেই কতকগুলি কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা সাহিত্য একাডেমী তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে না। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন বাংলা সাহিত্য একাডেমীর অথরিটিই লোকচক্ষে চূড়ান্ত হবে। ভাষাঘটিত বা সাহিত্যঘটিত বিতর্কের সময় একাডেমীর বক্তব্যই সর্বজনমান্য হবে। বলা বাহুল্য, সে অবস্থা প্রস্তাব পাশ করলেই আসবে না। দল থাকলেই আসবে না। অর্থবান হলেই আসবে না। অথরিটি ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়। পঞ্চাশ বছরও তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ধৈর্য ধরতে হবে। একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে হবে। অন্ততঃ পাঁচজন সাহিত্যিককে একত্র করা চাই যাঁদের কথার দাম আছে। ফরাসী একাডেমীর সদস্যসংখ্যা মাত্র চল্লিশজন। সেই চল্লিশজনকে বলা হয় 'অমরবৃন্দ'। সদস্যপদ লাভের জন্যে বড়ো বড়ো রাজনীতিক ও সেনানায়করাও উদ্‌গ্রীব, যদি সাহিত্যে কিছু কাজ থাকে। একদিন হয়তো বাংলা সাহিত্য একাডেমীরও তেমনি সুযশ হবে।

গ্রন্থকার আর গ্রন্থাগার যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। গ্রন্থকার না থাকলে গ্রন্থাগার থাকে না। আর গ্রন্থাগার না থাকলে গ্রন্থকারের সৃষ্টি ধারণ করে রাখবে কে? বলা বাহুল্য ঘরোয়া গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগার। আবার শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগার।

তবে আমরা সাধারণত পাবলিক লাইব্রেরী অর্থেই গ্রন্থাগার শব্দটি ব্যবহার করি। পাবলিক লাইব্রেরী এদেশের মাটিতে নতুন। সবচেয়ে পুরাতন পাবলিক লাইব্রেরীর বয়সও দেড় শতাব্দীর বেশী নয়। এসব লাইব্রেরীর দ্বারা পাঠকসাধারণের অশেষ উপকার হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয়। এখনো এদেশের বৃহত্তর জনসাধারণ পাবলিক লাইব্রেরীর সেবা থেকে বঞ্চিত।

গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একাজ বেশীদিন ফেলে রাখা যাবে না। কেবলমাত্র পাঠশালা বিদ্যালয় বা কলেজ থেকেই সকলে শিক্ষালাভ করতে পারে না। করলেও তা বিশ বাইশ বছরে ফুরিয়ে

যাবে। কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করে তারা শিক্ষিত বলে গণ্য হবে তা ঠিক। কিন্তু চর্চা না করলে প্রত্যেক বিদ্যাই বাসি হয়ে যায়। বিশেষ করে আজকের দিনে জ্ঞানবিজ্ঞান যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলে শিক্ষিত ব্যক্তিও সেকেলে হয়ে যান। সুতরাং তরুণ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা হারান।

কলেজের পড়াই যথেষ্ট নয়। তার পরেও আরো পড়াশুনা করতে হবে। আজীবন অধ্যয়ন করা চাই। রবীন্দ্রনাথকে তা করতে দেখেছি। মৃত্যুর একবছর আগেও তিনি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে 'ম্যাথেমেটিক্স ফর দ্য মিলিয়ন' নিয়ে পড়েছিলেন। আর একজন জ্ঞানতপস্বীর নিকট সংস্পর্শে এসেছি। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কখনো সংস্কৃত, কখনো প্রাকৃত, কখনো ফরাসী, কখনো জার্মান ভাষার বই হাতে নিয়ে বসেছেন বা শুয়েছেন। তাঁর তৃষ্ণার জল।

সাধারণ মানুষকে সারাজীবন এই তৃষ্ণার জল জোগাবে কে? পাবলিক লাইব্রেরী। দেশে অসংখ্য পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে আর তাতে অসংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রাখতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রথম প্রস্তাবের চেয়ে কঠিন। সাহিত্যের রুচি এত নিচে নেমে গেছে যে তাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য পণ্ড। না দিলেও বিপদ। কেউ বই নেবে না, চাঁদা দেবে না। তখন লাইব্রেরীটাই সেকেলে হয়ে যাবে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কাশী থেকে হিন্দী ভাষায় একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়, তার নাম 'হংস'। সম্পাদক দুই সাহিত্যের দুই দিকপাল। হিন্দীর প্রেমচন্দ্। গুজরাটীর কন্হাইয়ালাল মুন্শী। হাঁস যেমন নীর থেকে ক্ষীর সংগ্রহ করে তেমনি 'হংস' করত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতির থেকে অনুবাদযোগ্য রচনা সংগ্রহ। সেসব রচনা হিন্দীতে অনুবাদ করে ভারতের সর্বত্র পরিবেশন। পাঠকরা পেতেন ভারতীয় সাহিত্যের স্বাদ। আমিও ছিলুম একজন আগ্রহী পাঠক। বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে সেইভাবে ঘটে আমার পরোক্ষ পরিচয়।

অনুবাদ ভিন্ন স্বদেশের বিচিত্র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের অন্য কোনো উপায় নেই। এ কাজ ইংরেজীতে 'মডান' রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকা করত। কিন্তু এটিকে নিজের একমাত্র কাজ করল 'হংস'। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রেমচন্দের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তারও তিরোধান ঘটে। মুন্শী বোধহয় একাই কিছুদিন চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বম্বের কংগ্রেস মন্ত্রী হয়ে সাহিত্য

থেকে সরে যান। তখন থেকে তারই মতো একটি অনুবাদ-পত্রের অভাব আমি অনুভব করেছি। অনুবাদের কাজ অবশ্য বন্ধ থাকেনি। কিন্তু একসঙ্গে অনুবাদ করারও একটি মহিমা আছে। পাশাপাশি পৃষ্ঠায় পনেরো ষোলটি ভাষার রচনাকে সারিবদ্ধ করা যেন লেখকদেরও একসারিতে বসিয়ে আরতি করা এতে ভারতভারতীরও আরতি।

আমাদের 'অনুবাদ পত্রিকা' যদি এই কাজটির ভার নেয় তা হলে সেটা কেবল সাহিত্যের কাজ নয়, দেশের কাজও হবে। মাধ্যমটা হিন্দী নয়, বাংলা। এতে কিছু এসে যাবে না। বরঞ্চ বাংলার যোগ্যতা প্রমাণিত হবে। অনেকে হয়তো এইজন্যে বাংলা শিখবেন। আমরা বাঙালীরাও হাতের কাছে অন্যান্য সাহিত্যের সম্ভার পাব। তবে অনুবাদ যেন সরাসরি মূল থেকে করা হয়। ইংরেজী বা হিন্দীর মধ্যস্থতায় নয়। একদল অনুবাদ-কর্মী চাই যাঁরা যত্ন করে বিভিন্ন ভাষায় বিশেষজ্ঞ হবেন। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই আজকাল বাঙালী লেখকলেখিকা আছেন, তাঁরা সেখানকার সাহিত্যে ওয়াকিবহাল। কেউ কেউ অনুবাদ করে অন্যত্র প্রকাশ করেছেন দেখা যায়। এঁরা যদি সহায় হন তবে আম্যদের এই 'অনুবাদ পত্রিকা' নিশ্চয়ই নীর থেকে ক্ষীর সংগ্রহ করে 'হংস' পত্রিকার অভাব পূরণ করবে। সম্পাদনার জন্যে অবশ্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন।

যুক্তাক্ষর বর্জন করার একটা ঝোঁক সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। খবরের কাগজে তো প্রতিদিনই, সাময়িক পত্র যদি লাইনো-টাইপে ছাপা হয় সাময়িক পত্রেও। সরকার থেকে মাঝে মাঝে বাংলায় টাইপ করা চিঠিপত্র পাই। তাতেও সেই ঝোঁক। টাইপিস্ট মশায় জানেন না কেমন করে যুক্তাক্ষর ভেঙে লিখতে হয়। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে লেখেন প্রেমেন্‌দ্র মিএ। লেখা উচিত মিত্‌র। কিন্তু তা হলে আবার দ্র না লিখে দ্‌র লিখতে হয়। কঠিন সমস্যা। কিন্তু তাই বলে মিত্রকে মিএ লেখা কি উচিত ?

এখন আমার আপত্তি অন্নদাকে অন্‌নদা করা নিয়ে নয়, শঙ্করকে শংকর বানান করা নিয়ে। আমরা জানি যে ম্‌ স্থলে ং লেখা ব্যাকরণসম্মত। যেমন, সম্বাদ না লিখে সংবাদ, সম্বরণ না লিখে সংবরণ। কিন্তু সম্‌ একটি উপসর্গ। শম্‌ তা নয়। শঙ্কর যদি শংকর হয় তবে শঙ্কা হবে শংকা, অঙ্ক হবে অংক, বিহঙ্গ হবে বিহংগ, বঙ্গ হবে বংগ।

সংস্কৃতভাষায় কেবল যে ম্‌ স্থলে ঙ চলে তাই নয়।

ঙ স্থলে, ঞ স্থলে, ণ্ স্থলে, ন্ স্থলে ং চালানো যায়। যে কোন দেবনাগরীতে ছাপা সংস্কৃত গ্রন্থ খুলে দেখবেন। বিশেষত বোম্বাইতে মুদ্রিত। আপ্টে মহাশয়ের অভিধান খুলে দেখছি গ্রন্থ হয়েছে গ্রংথ। শঙ্কর তো শংকর হয়েছেই। কিন্তু অন্ন হয়নি অংন। যদিও অন্ধ হয়েছে অংধ। অন্তর হয়েছে অংতর। তার চেয়ে ভয়ংকর কথা চন্দ্র হয়েছে চংদ্র। ইন্দ্র হয়েছে ইংদ্র।

হিন্দী ও মারাঠী লেখা হয় দেবনাগরী লিপিতে। তার অনুকরণে আজকাল গুজরাটী, ওড়িয়া প্রভৃতি লিপিতেও অনুস্বরের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। মহাত্মা লিখতেন গাংধী। উৎকলমণি লিখতেন গোপবংধু। তাঁর সহকর্মী লিখতেন নীলকংঠ। তবে নামের আগে যখন পণ্ডিত বসিয়ে দিতেন তখন কিন্তু পংডিত লিখতে দেখিনি। ইদানীং ওড়িয়া ভাষার যেসব বইপত্র হাতে আসছে তাতে অনুস্বরের ছড়াছড়ি। দিগংত, অনংত, সামংত মহাংতি এমনি কতরকম বানান। ওদিকে হিন্দী যদিও হিংদী হয়নি তবু দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী হয়েছে প্রধানমংত্রী আর মন্ত্রালয় হয়েছে মংত্রালয়। সম্বন্ধ হয়েছে সংবংধ। দণ্ডবিধি হয়েছে দংডবিধি। আচ্ছা, আপনারা কি কেউ কাংস্টীট্যুশনল হিষ্ট্রী অফ ইংডিয়া পড়েছেন? যদি না পড়ে থাকেন তবে পার্লিয়ামেংট্রী প্রেক্টিস বইখানা অবশ্যই পড়ে থাকবেন।

আমি সেই দিনটির প্রতীক্ষায় আছি যেদিন ঈশ্বরচন্দ্র হবে

ঈশ্বরচংন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র হবেন বংকিমচংদ্র, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় হবেন হেমচংদ্র বংদ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ হবেন রবীংদ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ হবেন সত্যেংদ্রনাথ। আমরা বংদে মাতরম্ গান করার পর গান ধরব পংজাব সিংধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বংগ। তারপর গাইব আমি চংচল হে আমি সুদূরের পিয়াসী। সুংদর হৃদিরংজন তুমি নংদন ফুলহার। নতুন করে গীতাংজলি আর চতুরংগ পড়ব। অচিংত্যকে চিনব, প্রেমেংদ্রকে ভালোবাসব, জীবনানংদকে বুঝব।

উপরে লিখেছি 'হিন্দী যদিও হিংদী হয়নি'। না, সেটা ঠিক নয়। একই রিপোর্টের পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখছি হিন্দী হয়েছে হিংদী। তবে কেন্দ্রীয় হয়নি কেন্দ্রীয়। হয়ে থাকতে পারে অন্য কোনো পৃষ্ঠায়। এখনও টাইপরাইটারে যুক্তাক্ষর লিখতে পারা যায়। পরে যখন সেটা সম্ভব হবে না তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও হবেন ইংদিরা গাংধী। তাঁর পদাংক অনুসরণ করে একে একে সকলেই সেই ধারা ধরবেন। আনংদবাজার পত্রিকার সঙ্গে পাল্লা দেবে যুগাংতর। অশোককুমার সরকার ওটা এড়াতে পারলেও তুষারকাংতি ঘোষ বা সুকমলকাংতি ঘোষ কি পারবেন? সংতোষকুমার ঘোষ ও নীরেংদ্রনাথ চক্রবর্তী যদি না পারেন তবে দক্ষিণারংজন বসু ও নদংগোপাল সেনগুপ্ত কেমন করে পারবেন? মুখ্যমংত্রী সিদ্ধার্থশংকরের সঙ্গে তরুণকাংতি, শংকর ঘোষ, অজিত পাংজা, মৃত্যুংজয় বংদ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিরও রূপাংতর ঘটবে। আমলাতংত্রেও এর

ঢেউ গিয়ে পৌঁছবে। সমাজতংত্রী নেতারাও কি বাদ যাবেন? "সব লাল হো জায়েগা" যখন হবে তখন হবে। তার আগে সব অনুস্বর বন্‌ জায়েগা।

কিন্তু আমি এক্ষেত্রে রক্ষণশীল। আমার দৌড় ওই বাংলা-দেশ ও বাংলা ভাষা অবধি। গানের ও কবিতার ছন্দ ঠিক রাখতে হলে ও ছাড়া উপায় নেই। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদও কাজ করেছেন। এখন তো বাংলাদেশ বলে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে। উচ্চারণ ও ছন্দের দিক থেকে শঙ্কর কিসে ভুল, শংকর কিসে ঠিক? দেবনাগরীর বা হিংদীর পথ আমার পথ নয়। আর টাইপরাইটার বা লাইনোর জন্যে আমি, না আমার জন্যে টাইপরাইটার ও লাইনো? এতে জনগণেরই বা এমন কী লাভ হবে? কাগজ বাঁচবে? ছাপা খরচ কমবে? যুক্তাক্ষর কি পুরোপুরি বর্জন করতে পারা যাবে?

সংস্কৃত ভাষায় অনুস্বরের উচ্চারণ ক বর্গের বেলা ঙ্‌, চ বর্গের বেলা ঞ্‌, ট বর্গের বেলা ণ্‌, ত বর্গের বেলা ন্‌। অন্যান্য ক্ষেত্রে ম্‌। বাংলা ভাষার এ নিয়ম খাটে না। সুতরাং এটা একটা অংধ অনুকরণ। এটা বংধ হলেই ভালো হয়।